নতুন

সন্দেশ

জানুয়ারি

২০০৪

ছোটদের সেরা মাসিকপত্র

এভারেস্ট জয়ের ৫০ বছর

বিশেষ আকর্ষণ

জয়বাবা ফেলুনাথ

ধারাবাহিক চিত্রনাট্য

বোম্বাইয়ের বোম্বেটে

কলকাতায় !

তলকালাম!!

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত

ছোটদের সেরা মাসিক পত্র

সন্দেশ

তৃতীয় পর্যায় বর্ষ ৪২ পৌষ ১৪১০

বিশেষ আকর্ষণ

এভারেস্ট + ৫০ : প্রসাদরঞ্জন রায় ৫

ভ্রমণ সাহিত্যের তিনি হিমালয় : দেবাশিস সেন ৬

চিত্রনাট্য : জয়বাবা ফেলুনাথ (ধারাবাহিক) ৬৩

পুরোনো সন্দেশ থেকে

শিকারের গল্প : কুলদারঞ্জন রায় ২৭

ধারাবাহিক উপন্যাস

যমুনাবতী : রাজা রায় ৩২

গল্প

ভ্যাটনাজোকুলের আতঙ্ক : শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৯

সেই চটি জোড়া : রাজকুমার রায়চৌধুরী ৪১

কবিতা

শীতের শুরু : কালীকৃষ্ণ গুহ ৩

মৌতাত : শ্রীকর নন্দী ২৫

খাতড়া যেতে : সোমনাথ চক্রবর্তী ২৫

আফ্রিকা ভ্রমণ : ভবানীপ্রসাদ মজুমদার ২৫

বিলেতি ছড়া : মানসী বড়ুয়া ২৬

প্রবন্ধ

দিগ্‌বিজয়ী কোকোর কাহিনী : ঋতা বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭

যে পাহাড় চোখে দেখা যায় না : সুবীর দত্ত ৩০

অসাধারন সেনাপতি : দিনবন্ধু হাজরা ৪০

সান্টা ক্লজ ও তাঁর বল্গা হরিণেরা ৪৮

ভ্রমণ

কুমাউঁর কোলে চরকিবাজ ৫০

খেলা

অলিম্পিক ও সেই কালো মানুষটি নির্মলকুমার সাহা ৫৪

কমিক্স

কমান্ডার বোস গৌতম কর্মকার (ধারাবাহিক) ১৩

নন্দগুপীর মন্দ কপাল দিলীপ দাস ৪৬

কার্টুন

একটি ছবির গল্প সর্বজিৎ সেন ২৯

বিভাগীয়

পাঁচ কথার প্যাঁচ : শুভেন্দু দাশমুন্সী ২৩

অঙ্কের মজা স্বপ্নাভ রায়চৌধুরী ৪৫

প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর জীবন সর্দার ৬১

মেঠো কড়চা ৫৩

কুইজ ৭০

ধাঁধা ৭১

শব্দজব্দ ৭২

হাত পাকাবার আসর ৫৭

লেখা আত্রেয়ী ভট্টাচার্য, সুশ্রুত চক্রবর্তী ও পুলস্ত্য পারেখ

ছবি: সাগ্নিক কুমার সেন

সম্পাদক

সন্দীপ রায়

যুগ্ম সম্পাদক

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রসাদরঞ্জন রায়

সম্পাদনা সহযোগিতা

সুমিতা সামন্ত

শিল্প নির্দেশনা

শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

বিশেষ সহায়তায় দেবাশিস সেন

সন্দেশ কার্যালয় ১৭২/৩ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ কলকাতা ৭০০ ০২৯ থেকে
প্রকাশিত এবং এস পি কমিউনিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড
২৯৪/২/১ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড (ফেডারেশন হল তৃতীয় তল)
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত

স্বত্বাধিকারী : সুকুমার সাহিত্য সমবায় সমিতি লিমিটেড

e-mail sandesh@onlysmart.com

শীতের শুরু

কালীকৃষ্ণ গুহ

শীতের শুরু।
পাতা ঝরছে পাতা ঝরছে পাতা—
তার ভিতরে
হারিয়ে গেছে রিনির অঙ্কখাতা।

শীতের শুরু।
বিকেলবেলা কৃষ্ণচূড়ার ডালে
রোদ পড়েছে
যেমন পড়ে রোজ সাতসকালে।

শীতের শুরু।
রাতের আকাশ তারায় তারায় ঘেরা—
মধ্যিখানে
কালপুরুষের শিকার খুঁজে ফেরা।

ছবি : শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

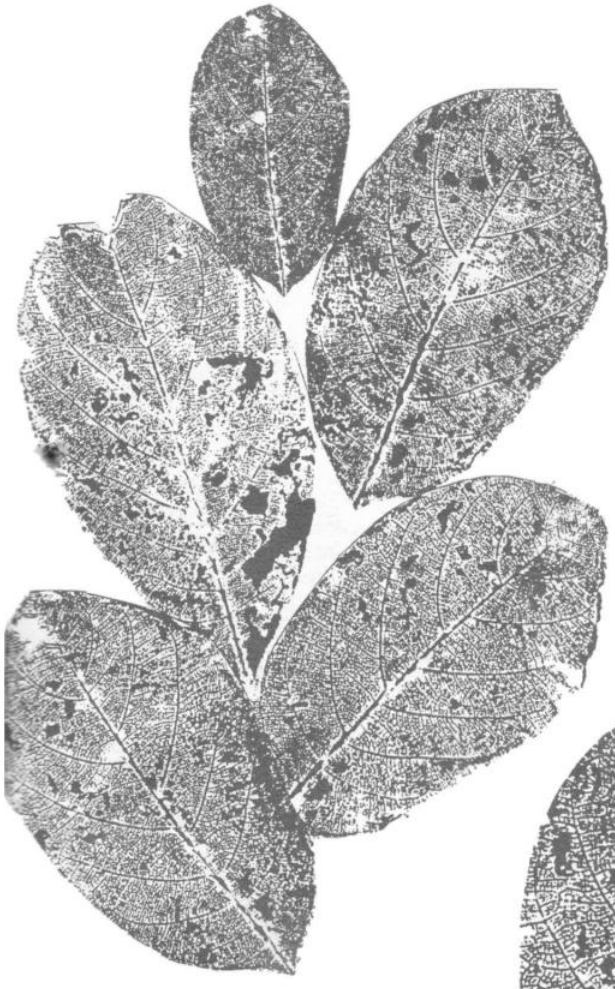

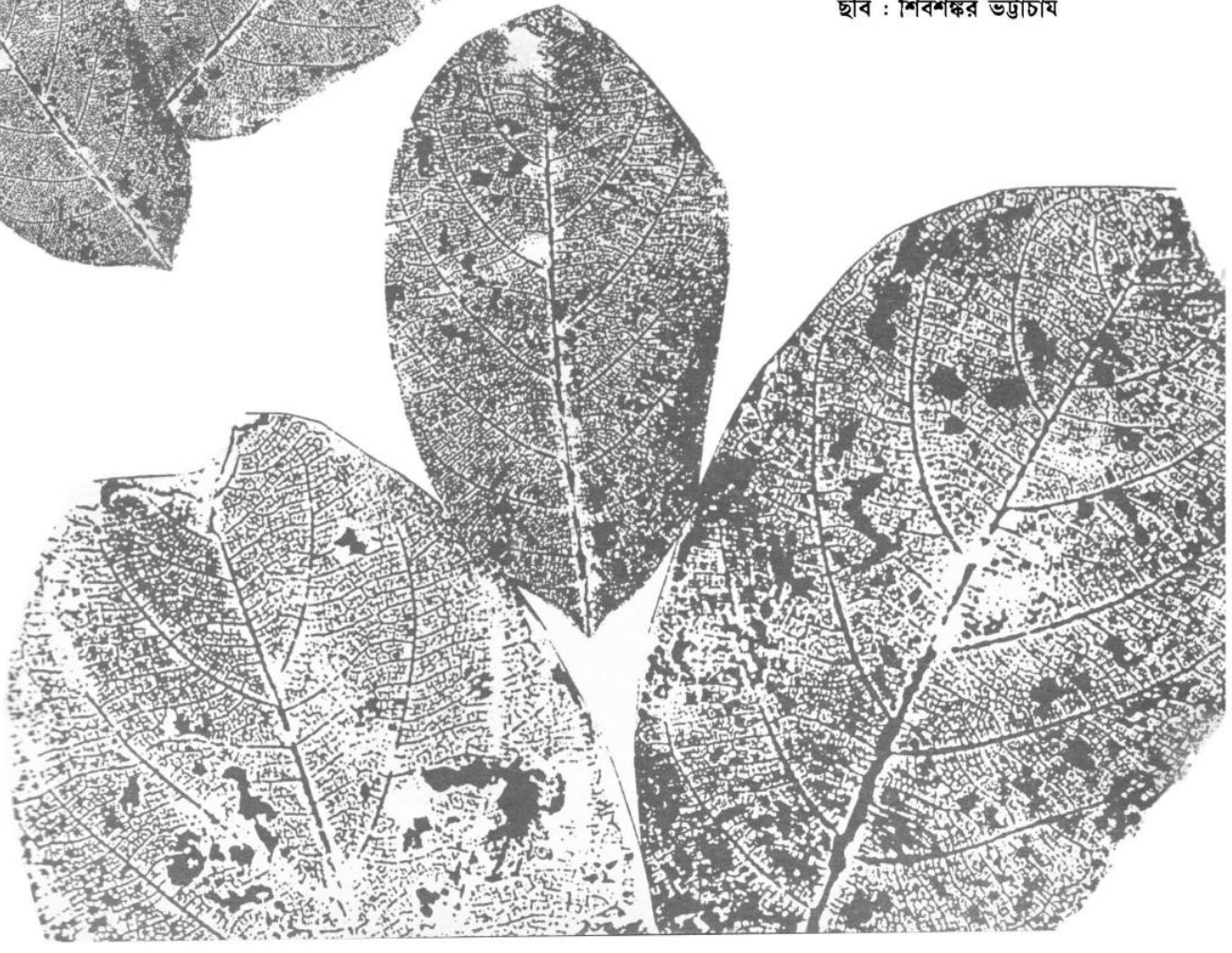

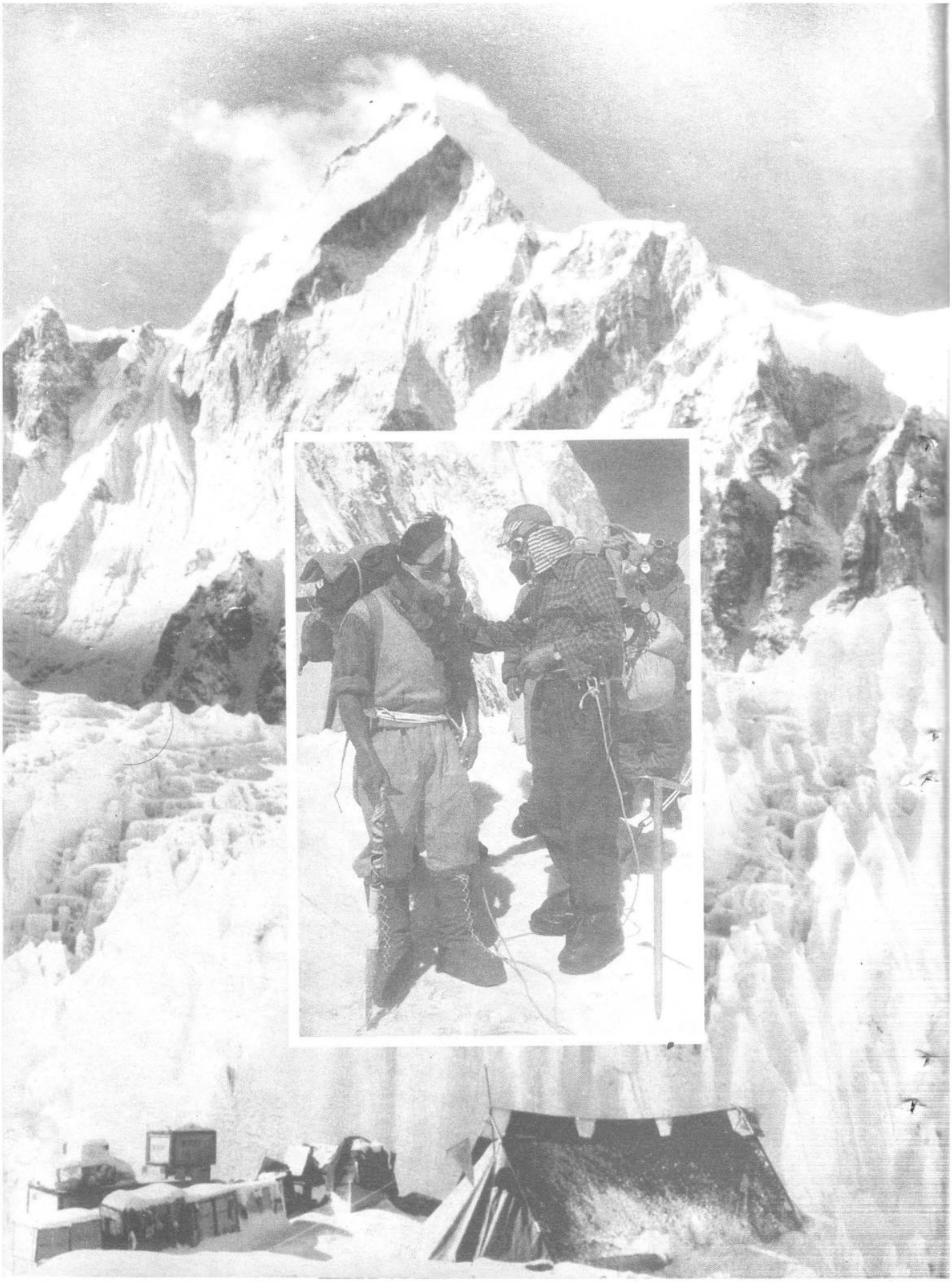

এভারেস্ট + ৫০

প্রসাদরঞ্জন রায়

গোড়ার কথা

কোনও সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে ম্যালরি নাকি বলেছিলেন : পাহাড়ে চড়ি কেন? ওটা খাড়া দাঁড়িয়ে আছে বলেই তো!

পাহাড়-চূড়ায় ওঠার এই নেশা ইউরোপে আরম্ভ হয়েছিল ১৮ শতকে। ১৭৮৬ সালে আল্পসের সর্ব্বোচ্চ চূড়া মঁ ব্লাঁ-তে পা রাখেন বালমা ও পাকার্দ। সেই শুরু। ১৮৬৫ সালের মধ্যে ম্যাটারহর্ন সমেত আল্পসের সব চূড়াগুলিই পরাজিত হল। অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় মানুষ ছুটলেন আফ্রিকায়, আমেরিকায়— পদানত হল সব চূড়াই। বাকি রয়ে গেল কেবল হিমালয়ের উচ্চতম চূড়াগুলি। এবার সেদিকে নজর পড়ল।

ভারতের উত্তরে প্রসারিত হিমালয় পর্বতমালা উত্তর-পূর্ব থেকে উত্তর-পশ্চিম পর্যন্ত প্রায় সম্পূর্ণ ঘিরে রেখেছে ভারত ভূখণ্ডকে। হিমালয়কে বলা হয় 'ফোল্ড মাউন্টেন' অর্থাৎ পৃথিবীর গায়ের চামড়া কুঁচকে এই পাহাড়ের সৃষ্টি। আদিতে 'সুপার-কন্টিনেন্ট'-গন্ডোয়ানাল্যান্ড ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে উত্তরে চলার পথে প্রায় ১০ কোটি বছর আগে ভারত এসে ঠেকে এশিয়ার দক্ষিণে— সেখানে তখন ছিল টেথিস সাগর। এই প্রবল চাপে স্থলভাগ কুঁচকে হিমালয়ের সৃষ্টি। এখন এই পর্বতমালা অনেকটা স্থিতাবস্থায় এলেও এখনও এই উত্তরাভিমুখী গতিবেগ বছরে প্রায় ১.৫ সেমি। বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস হিমালয়ের বয়স ৫.৫ কোটি বছর এবং আরাবল্লি, বিন্ধ প্রভৃতি পর্বতমালার তুলনায় হিমালয় বয়সে অনেক নবীন।

এভারেস্টের অবস্থিতি নেপাল-তিব্বত সীমান্তে। ঐ অঞ্চলের তিব্বতীদের কাছে শৃঙ্গটির নাম চো-মো-লাং-মা (পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী)। নেপালে এভারেস্টকে বলা হয় সাগরমাতা, তবে এ নামটি সম্ভবত অনেক নবীন। ১৯ শতকের 'গ্রেট ট্রিগনোমেট্রিকাল সার্ভে'-র খাতায় এর প্রথম উল্লেখ 'পিক-বি' নামে, পরে নামকরণ হয় 'পিক-১৫'। ১৮৫২ সালে এটি বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হিসেবে স্বীকৃত হয় আর ১৮৬৫ সালে প্রাক্তন সার্ভেয়ার-জেনারেল এভারেস্টের নামে এর নামকরণ হয় মাউন্ট এভারেস্ট। প্রসঙ্গত বলা যায় কোন মানুষের নামে পাহাড়চূড়ার নামকরণ পদ্ধতি আজ আর স্বীকৃত নয়— তবে কি এভারেস্টও আর এভারেস্ট থাকবে না? নেপাল আর চীনের প্রবল মতপার্থক্যের জন্যেই এ নামটি টিকে আছে এখনও।

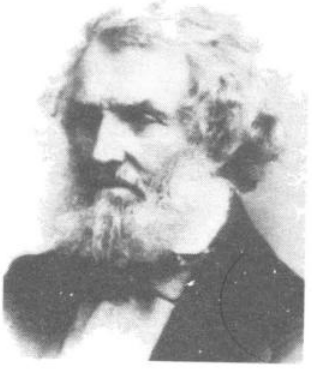

স্যার জর্জ এভারেস্ট

১৮ শতক পর্যন্ত আন্দিজের চিম্বোরাজো স্বীকৃত ছিল বিশ্বের সর্বোচ্চ চূড়া রূপে। ১৯ শতকে এ সম্মান পায় যথাক্রমে ধৌলাগিরি, নন্দাদেবী এবং কাঞ্চনজংঘা। ১৮৪১ সালে এভারেস্ট বা 'পিক-১৫'-র অবস্থিতি জানা গেল এবং অনেকে মনে করছিলেন এ সম্মান 'পিক-১৫'-রই প্রাপ্য, যদিও আদতে তার মাপ আরম্ভ হয় ১৮৪৯-৫০ সালে। ছটি 'বেসস্টেশন' থেকে এর উচ্চতা মাপা হয় ২৮,৯৯০ থেকে ২৯,০২৬ ফুট, গড়ে ২৯,০০২ ফুট। 'সার্ভে অফ ইন্ডিয়া' এ তথ্য প্রকাশ করে ১৮৫২ সালে। এই উচ্চতা মাপার সঙ্গে কলকাতার এক বিখ্যাত মানুষ

রাধানাথ শিকদারের নাম জড়িত। রাধানাথ সে যুগের বিখ্যাত গণিতজ্ঞ আর সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার চিফ কম্পিউটার ছিলেন। সাম্প্রতিককালে লেখা হয়েছে যে রাধানাথ নয়, হেনেসি নামে এক অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান চিফ কম্পিউটারের প্রাপ্য এই সম্মান। ১৮৪৯ সালে রাধানাথ দেরাদুন থেকে কলকাতায় চলে আসেন এবং দেরাদুন অফিসের দায়িত্ব নেন হেনেসি। এভারেস্টের উচ্চতা মাপার দায়িত্বে ছিলেন তৎকালীন সার্ভেয়ার-জেনারেল ওয়া এবং নিঃসন্দেহে হেনেসি ও রাধানাথ দুজনেই একাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রসঙ্গত বলা যায়, ওয়া সাহেবের পর সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার কর্তৃপক্ষ রাধানাথের উপর সদয় ছিলেন না ও শেষ পর্যন্ত রাধানাথ কাজে ইস্তফা দেন।

পরে ১৯৫২ সাল থেকে সার্ভে অফ ইন্ডিয়া আবার মাপ-জোক করেন এবং ১৯৫৪ সালে আর, এল, গুলাটির হিসেব অনুযায়ী এর উচ্চতা ২৯,০২৮ ফুট মেনে নেওয়া হয়। সাম্প্রতিককালে বিশেষজ্ঞরা মনে করেছিলেন যে 'গ্রিনহাউস এফেক্ট'-এর ফলে হিমালয়ের বরফ গলে যাচ্ছে এবং বর্তমান উচ্চতা হয়তো কমে গেছে। ১৯৯৮ সালের মার্কিনি অভিযাত্রীরা এভারেস্টের চূড়ায় ওঠে সর্বাধুনিক 'জি, পি, এস' সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে।

এরিক শিপটন

তাঁদের পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে মার্কিনি অধ্যাপক ব্র্যাডফোর্ড ওয়াশবার্ন ঘোষণা করেন যে এভারেস্টের আসল উচ্চতা ৮,৮৫০ মিটার বা ২৯,০৩৫ ফুট। এটিই বর্তমান স্বীকৃত উচ্চতা।

অবশ্যই এভারেস্ট একা নয়, পৃথিবীর উচ্চতম ১৪টি চূড়ার উচ্চতা ৮,০০০ মিটারের বেশি এবং সবকটিই বৃহত্তর হিমালয়-পামির-কারাকোরাম অঞ্চলে অবস্থিত। উচ্চতা অনুসারে এই তালিকায় আছে :

ভ্রমণ সাহিত্যের তিনি হিমালয়

২৫/২৬ বছর বয়সে প্রথম হিমালয় ভ্রমণে গেছিলেন উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। আর তারপর তাঁর দীর্ঘ জীবনে বারবার তিনি ছুটে গেছেন ঐ দেবতাত্মা নগাধিরাজের কাছে, তার টানে। আর তাঁর ওই অভিজ্ঞতা যাদুকরী লেখনীর ছোঁয়ায় সৃষ্টি করেছে এক একটি অসামান্য দলিল।

বিশাল রহস্যময় হিমালয় যুগ যুগ ধরে আকর্ষণ করে আসছে ভ্রমণ পিপাসুদের। হিমালয়ের চড়াই, উৎড়াই, সবুজ ঠাসবুনোট আকাশ ছোঁয়া অরণ্য, কখনো বা গাছপালাহীন রুক্ষ পাহাড় জমি, নীল জলের হ্রদ, আবার পনের-ষোল হাজার ফিট উচ্চতাতেও ধুধু মরুভূমি, তুষারশৃঙ্গ,, হিমবাহ, খরস্রোতা নদী, বিচিত্র সব পশু-পাখি, রং-বেরং-এর ফুল, প্রজাপতি আর সরল, নিষ্পাপ পাহাড়ি লোকগুলি। যে ভ্রমণ পথিক একবার হিমালয়ের এই বৈচিত্রের স্বাদ পেয়েছে, সেদিনই ঘটে যায় তার নাগরিক জীবনের মোহভঙ্গ। বারবার তাকে ছুটে যেতে হবে ঐ হিমালয়ের বুকে। তেমনই এক ভ্রমণ পথিক উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। কিন্তু অন্য সব ভ্রমণার্থীদের থেকে উমাপ্রসাদ অনেকটাই আলাদা। উমাপ্রসাদই শুধু হিমালয়কে ভালোবাসেন নি, হিমালয়ও ভালোবেসেছিল উমাপ্রসাদকে। পাহাড়ি লোকগুলির আপনজন ছিলেন উমাপ্রসাদ। ওদের কাছে তাঁর পরিচয় ছিল 'উমাবাবু'। বিশেষ করে গাড়োয়াল অঞ্চলে কিছুদিন তিনি অনুপস্থিত থাকলেই স্থানিয় লোকেরা অন্য ভ্রমণার্থীদের কাছে প্রশ্ন করত, 'উমাবাবু এবার এলেন না?'

বাংলার বাঘ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়-এর তৃতীয় পুত্র উমাপ্রসাদের জন্ম ১৯০২ খ্রিস্টাব্দের ১২ই অক্টোবর। সেদিন ছিল বিজয়া দশমী। তাই তাঁর ডাক নাম বিজু। বিখ্যাত বাবা এবং দাদার (শ্যামাপ্রসাদ) সাফল্যের আলোকে উমাপ্রসাদের প্রতিভা কিছুটা আড়ালে থেকে গেছে। অসাধারণ ছাত্র ছিলেন উমাপ্রসাদ। প্রবেশিকা

হেনরি টিলম্যান

এভারেস্ট, কে-২, কাঞ্চনজংঘা, লোৎসে, মাকালু, চো ওয়ু, ধৌলাগিরি, মানাসলু, নাঙ্গা পর্বত, অন্নপূর্ণা-১, গাশেরব্রুম-১, ব্রড পিক, গাশেরব্রুম-২ ও শিশাপাংমা। এদের অধিকাংশই নেপাল-চিন বা পাকিস্তান-চিন সীমান্তে, কেবল কাঞ্চনজংঘা ভারত-নেপাল সীমান্তে। সুতরাং, ভারতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ কাঞ্চনজংঘা।

এভারেস্ট অভিযান

১৮৮০-র দশক থেকে হিমালয় অভিযান শুরু হয়। ১৮৯২ সালে কারাকোরাম ও ১৮৯৫ সালে নাঙ্গা পর্বত অভিযান হয়। এযুগের ভারতীয় অভিযাত্রীদের মধ্যে নৈন সিং, কিশেন সিং, হরিরাম বা কিনথুপের নাম স্মরণীয়। তাঁরা লুকিয়ে তিব্বতে হিমালয় অঞ্চলে সার্ভের কাজ করেছিলেন। ১৯০৩ সালে ইয়াংহাসব্যান্ড লাসা পৌঁছন এবং তিব্বতের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের চুক্তিও হয়। ১৯২০ সালে তিব্বত সরকার তিব্বত দিয়ে এভারেস্ট অভিযানের রাস্তা খুলে দেন। তখন দার্জিলিং থেকে সিকিম হয়ে তিব্বতে গিয়ে উত্তরদিক থেকে এভারেস্টে যাবার পথ খোঁজা শুরু হল।

১৯২১ সালে প্রথম ব্রিটিশ অভিযান শুরু হয়, নেতৃত্বে ছিলেন কর্ণেল হাওয়ার্ড-বেরি। ম্যালরি ও বুলক এই অভিযানে রংবুক হিমবাহ আবিষ্কার করেন ও সেখান থেকে এভারেস্টের উত্তরে 'নর্থ কল' পৌঁছান। শুধু যাত্রাপথের সরেজমিন তদন্ত করলেও এই অভিযানে ডা. আলেকজান্ডার কেলাস যাত্রাপথেই মারা যান, পরে মারা যায় আরেকজন কুলিও। এভারেস্ট অভিযানে প্রাণ হারানোর সেই শুরু।

১৯২২ সালে দ্বিতীয় ব্রিটিশ অভিযানের নেতৃত্ব দেন ব্রিগেডিয়ার ব্রুস। এ দলে ছিলেন ম্যালরি, নর্টন,

পরীক্ষায় দ্বিতীয় এবং ইন্টারমিডিয়েটে প্রথম স্থান পান তিনি। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এ. ইংরেজি অনার্স পরীক্ষাতেও উমাপ্রসাদ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করেন। এম. এ. (ললিত কলা) এবং আইন পরীক্ষাতেও তিনি প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। প্রথম জীবনে তিনি কিছুদিন আইন কলেজে অধ্যাপনা করেছিলেন, একই সঙ্গে করেছিলেন ওকালতিও। কিন্তু বেশি দিন নয়। এরপরেই হিমালয়ের আসক্তি তাঁকে নিয়ে গেছে অন্য জগতে। ওকালতি ব্যবসা থেকে স্বেচ্ছা নির্বাসন আইন জগতকে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে তা বলতে পারব না, কিন্তু বাংলা ভ্রমণ সাহিত্য ক্ষেত্রকে দারুণভাবে উপকৃত করেছে।

হিমালয় ভ্রমণ নিয়ে অসংখ্য বই আছে উমাপ্রসাদের। **মণিমহেশ, ত্রিলোকনাথের পথে, কুঁয়ারি গিরিপথে, বৈষ্ণোদেবী, অরুণাচলে মোনপাদের দেশে শেরপাদের দেশে, গোঁসাই কুণ্ডু, কৈলাস ও মানস সরোবর, কেদারনাথ, হিমালয়ের পথে পথে** ইত্যাদি। হিমালয় ছাড়াও তাঁর ভ্রমণ সাহিত্যে এসেছে অন্য অঞ্চলও, যেমন **আফ্রিদি মুল্লুকে, জলযাত্রী, পালামৌর জঙ্গলে** ইত্যাদি। কিন্তু শুধু ভ্রমণকাহিনি নয়। তাঁর ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণা (**অ্যালবাম, পুনশ্চ অ্যালবাম, ক্যালাইডোস্‌কোপ**) অসাধারণ লেখনীর দৌলতে হয়ে উঠেছে সর্বজনীন। উমাপ্রসাদের **মণিমহেশ** পেয়েছিল অকাদেমি পুরস্কার— ভ্রমণ-সাহিত্যে প্রথম অকাদেমি প্রাপ্ত গ্রন্থ এবং এখন পর্যন্ত একমাত্র গ্রন্থ।

ভবানীপুরে স্যার আশুতোষের বাড়ি থেকেই উমাপ্রসাদের উদ্যোগে প্রকাশিত হত বঙ্গবাণী নামে একটি অভিজাত মাসিক সাহিত্য পত্রিকা।

লেখক, প্রকাশক, অধ্যাপক, আইনজীবি— এই সব পরিচয় ছাপিয়ে উমাপ্রসাদের একটি পরিচয়ই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, সেটি— হিমালয়-প্রেমী উমাপ্রসাদের। উমাপ্রসাদ লিখেছেন, "সারা জীবন এই বিশাল গিরিশ্রেণীর অন্দরে-কন্দরে আকাশ-চুম্বী শিখরে শিখরে ঘুরে বেড়ালেও কতটুকুই বা এর দেখা সম্ভব। তবু বারবার ফিরে আসি।"

দেবাশিস সেন

শেষ যাত্রায় ম্যালরি ও আরভিন

সমারভেল, ফিঞ্চ প্রমুখ নামজাদা পর্বতারোহীরা। উত্তর-পূর্ব দিয়ে অভিযান চালিয়ে ফিঞ্চ ও ক্যাপটেন ব্রুস ৮,৩২০ মি উচ্চতায় পৌঁছান। এর দু-বছর বাদে তৃতীয় অভিযানেও নেতৃত্ব দেন ব্রিগেডিয়ার ব্রুস, এবং নর্টন একা ৮,৫৮০ মি পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু এ অভিযানের 'ট্রাজিক হিরো' ম্যালরি আর আরভিন, তাঁরা শৃঙ্গ জয়ের চেষ্টায় চিরতরে হারিয়ে যান। তাঁদের শেষ দেখা গিয়েছিল ৮,৪৫০ মি উচ্চতায়।

১৯৩৩ সালে চতুর্থ ব্রিটিশ অভিযান। নেতা হিউ রাটলেজ। এবারে হ্যারিস, ওয়েজার ও স্মাইথ পৌঁছেছিলেন ৮,৫৮০ মি উচ্চতায় কিন্তু আবারও তাঁদের বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসতে হয়। এর পরের বছর মরিস উইলসন নামে এক আধা-পাগলা ব্রিটিশ ক্যাপ্টেন একাই এভারেস্টে যাত্রা করেন এবং হারিয়ে যান চিরতরে। ১৯৩৫ সালে এরিক শিপটনের নেতৃত্বে পঞ্চম অভিযান যাত্রা করে কিন্তু আবহাওয়া খারাপ হয়ে যাওয়ায় ফিরে আসতে বাধ্য হন। এই অভিযাত্রীদলের সঙ্গে প্রথম বার অভিযানে যান তেনজিং নামে এক তরুণ শেরপা।

১৯৩৬ সালে ষষ্ঠ অভিযান। এবারেও রাটলেজ, শিপটন, স্মাইথ প্রমুখ ওস্তাদ পর্বতারোহীরা দলে ছিলেন কিন্তু বর্ষা নেমে যাওয়ায় এঁরাও ফিরে আসতে বাধ্য হন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে শেষ (সপ্তম) অভিযান ১৯৩৮ সালে টিলম্যানের নেতৃত্বে। ৮,৩২০ মি পর্যন্ত পৌঁছে প্রবল তুষারপাতে তাঁদের ফিরে আসতে হয়। এরপর ১৯৪০-এর দশকে আর কোনও বড় অভিযান এভারেস্ট অভিমুখে যেতে পারেনি। কিন্তু পঞ্চাশের দশকে পরিস্থিতি পাল্টে যায়।

এভারেস্ট অভিযান, ১৯৫০-১৯৬০

১৯৫০ সালে একদিকে চিন সরকার তিব্বত দিয়ে অভিযান নিষিদ্ধ করে দেন, অন্যদিকে নেপাল সরকার দক্ষিণের পথ খুলে দেন। ফলে এভারেস্টের উত্তরে রংবুক হিমবাহ আর 'নর্থ কল'-এর পরিবর্তে দক্ষিণে নেপালের নামচে বাজার থেকে খুম্বু হিমবাহ আর 'সাউথ কল' দিয়ে যাত্রা আরম্ভ হয়। এই পথ ভালভাবে জরিপ করার জন্য ১৯৫০ ও ১৯৫১ সালে দুটি অভিযান এই নতুন পথে যাত্রা করে। খুম্বু হিমবাহে প্রথম পা রাখেন এই অভিযাত্রীরা।

১৯৫২ সালে অভিযানের পালা আসে সুইস দলের। এবছরই প্রথম দুটি অভিযান হয়, একটি বর্ষার আগে ও অন্যটি বর্ষার পরে। 'সাউথ কল' দিয়ে প্রথম অভিযানে শেরপা সর্দার তেনজিং-এর সঙ্গে সুইস পর্বতারোহী রেমন্ড ল্যাম্বার্ট পৌঁছান ৮,৫৯৫ মি উচ্চতায়, এ পর্যন্ত এটিই উচ্চতার রেকর্ড। দ্বিতীয় অভিযানটি কিন্তু খারাপ আবহাওয়ার জন্য 'সাউথ কল' ছাড়িয়ে আর যেতে পারেনি।

পরের বছর তোড়জোড় চলছিল ব্রিটিশ অভিযানের। এরিক শিপটন অভিযানের নেতা হবেন আশা করছিলেন কিন্তু সবাইকে অবাক করে নেতা নির্বাচিত হল কর্ণেল জন হান্ট। অভিযাত্রী দলে ইভান্স, বুর্দিলঁ, গ্রেগরি, নয়েস, হিলারি, লো প্রভৃতি পর্বতারোহীরা ছিলেন, শেরপা সর্দার ছিলেন তেনজিং নোরগে। ১০ মার্চ কাঠমাণ্ডু ছেড়ে অভিযাত্রীরা বেস ক্যাম্পে পৌঁছন ১৩ এপ্রিল। তাঁরা 'সাউথ কল'-এ পৌঁছন ২২ মে। এখান থেকে ২৬ মে ইভান্স ও বুর্দিলঁ শিখর অভিমুখে যাত্রা করেও শেষ ১০০ মিটার আর

হিলারি ও তেনজিং

অতিক্রম করতে পারেনি। ২৯ মে সকাল ১১-৩০ মিনিটে সেই পদক্ষেপ নিলেন তেনজিং আর হিলারি। কে আগে শিখরে পৌঁছেছিলেন এ প্রশ্নের উত্তর কেউ দেননি, বলেছেন একটি যৌথ প্রচেষ্টা। এভারেস্টের চূড়ায় তেনজিং-এর একটি ছবি জগৎ জুড়ে খ্যাতি অর্জন করেছে, ছবিটি তুলেছেন অবশ্যই হিলারি। কিন্তু হিলারির কোন ছবি নেই কারণ তেনজিং ক্যামেরা ব্যবহার করতে জানতেন না। এই সাফল্যের খবর সাঙ্কেতিক ভাষায় পাঠিয়ে দিলেন কর্ণেল হান্ট, ইংল্যান্ডে রানি এলিজাবেথের অভিষেকের দিন তা ঘোষিত হল। সারা পৃথিবীতে সাড়া পড়ে গেল।

ব্যক্তিগত জীবনে দুজনের মধ্যে ফারাক ছিল বিস্তর। তেনজিং গরিব শেরপা, মালবাহক ও পথপ্রদর্শক হিসেবে তাঁর স্বীকৃতি। জন্ম সম্ভবত ১৯১৪ সালে, সালটা তেনজিং-এরও ঠিক জানা নেই। তিব্বতের খারতা অঞ্চল থেকে তাঁদের পরিবার এসেছিলেন নেপালের নামচে অঞ্চলে, সেখান থেকে কাজের খোঁজে তেনজিং যান দার্জিলিং-এ ১৯৩২ সালে। ১৯৩৫ সালে তাঁর প্রথম অভিযান, পরে শেরপা সর্দার হিসেবে স্বীকৃতি। সপ্তম অভিযানে এই বিরাট সাফল্য। তুলনায় হিলারি কিছুটা অবস্থাপন্ন পরিবারের সন্তান। তাঁর পরিবার নিউজিল্যান্ডে চাষ-বাস ও মৌমাছি পালন করতেন। বয়সে তেনজিং-এর থেকে বছর ছয়েক ছোটো, ১৬ বছর বয়সে প্রথম পাহাড়ে যান। ১৯৪৬ থেকে পর্বতারোহণ শুরু, পরে শিপটনের সঙ্গে হিমালয় অভিযানে নাম করেন। এই দারুণ সাফল্য দুজনকে কাছাকাছি নিয়ে আসে, যদিও ভাঙা ভাঙা হিন্দি বা ইংরিজি ছাড়া তাঁদের মত বিনিময়ের কোন উপায় ছিল। এই সাফল্যের ফলে তেনজিং পেলেন জর্জ ক্রস (পরে, পদ্মভূষণ) ও জীবিকা উপার্জনের একটা উপায়, হিলারি হয়ে গেলেন স্যার এডমন্ড। এ নিয়ে বিস্তর সমালোচনা হয়েছে কিন্তু ১৯৮৬ সালে তেনজিং-এর মৃত্যু পর্যন্ত দুজনের মধ্যে সৌহার্দ্য ছিল অক্ষুণ্ণ। তেনজিং-এর মাধ্যমেই হিলারি শেরপাদের জীবন সম্পর্কে উৎসাহী হয়ে ওঠেন, পরে তিনি নেপালে হাই-কমিশনার হয়েছিলেন। দুজনের মধ্যে মিল এখানেই শেষ নয়, দুজনের পুত্রই পরবর্তীকালে বাবার মতন এভারেস্টে পা দিয়েছেন। অবশ্য তেনজিং-এর ছেলে জামলিং একা নয়, তেনজিং-এর দুই ভাগ্নে নাওয়াং গোম্বু ও দর্জি লাটু আর নাতি তাশি তেনজিংও এভারেস্টে

EVEREST CONQUERED

SUMMIT REACHED BY TEAM FROM BRITISH EXPEDITION

চড়েছেন। এরকম পারিবারিক সাফল্যের **অন্য কোনও** কিছুতে নজির নেই।

১৯৫৩ সালের সফল অভিযানের পর **আবার** ১৯৫৬ সালে সুইস অভিযাত্রীদল যাত্রা করে **লোৎসে** ও এভারেস্টে। ঐ বছরের ২৩ ও ২৪ মে চারজন অভিযাত্রী এভারেস্টের চূড়োয় পৌঁছন। ৫০-এর দশকের সাফল্যের খতিয়ান এখানেই শেষ।

এভারেস্ট অভিযান, পরের কথা

৬০-এর দশক থেকে পরিস্থিতি প্রায় সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। ১৯৬০ সালে উত্তর দিক থেকে এক চিনা অভিযানের সাফল্য ঘোষিত হয়, তিনজন শিখরে উঠেছিলেন। আবার সাফল্য পায় ১৯৬৩ সালের মার্কিনি অভিযান, এবার দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিয়ে ৬জন শিখরে ওঠেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন তেনজিং-এর ভাগ্নে নাওয়াং গোম্বু। ইতিমধ্যে এভারেস্টে ভারতীয় অভিযানও শুরু হয়। ১৯৬০ সালে ব্রিগেডিয়ার জ্ঞান সিং-এর নেতৃত্বে ৮,৬২৫ মি আর ১৯৬২ সালে মেজর জন ডায়াসের নেতৃত্বে ৮,৭২০ মি পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব হয়েছিল। এভারেস্টের চূড়ায় এখনও কোন বাঙালি পা দেননি তবে এই দুটি অভিযানেই অনেক দূর পর্যন্ত গিয়েছিলেন ফ্লাইট লেফটেনান্ট এ. কে. চৌধুরী। পরে তিনি দার্জিলিং হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টরও হয়েছিলেন। ভারতীয় অভিযানে সাফল্য আসে ১৯৬৫ সালে কম্যান্ডার এম.এস. কোহলির নেতৃত্বে। এবার ৯ জন পর্বতারোহী সাফল্য পান, তার মধ্যে প্রথম নাওয়াং গোম্বু দ্বিতীয়বার এভারেস্টের শিখরে পা রাখেন। এই দলেও একজন বাঙালি ছিলেন— ক্যাপ্টেন অরুণ চক্রবর্তী। ব্রিটেন, সুইজারল্যান্ড, চিন ও আমেরিকার

একালের শেরপা (বাঁদিক থেকে) : বাবু ছিরি শেরপা, তাশি তেনজিং, পারটেম্বা ও আপা শেরপা

পর ভারতই পঞ্চম দেশ যে এই সাফল্য অর্জন করে। এর পরেও ভারতীয় অভিযাত্রীরা সাফল্য পেয়েছে ১৯৮৪, ১৯৯২, ১৯৯৩, ১৯৯৫, ১৯৯৮, ১৯৯৯ ও ২০০৩ সালে।

১৯৬৬ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত নেপাল থেকে অভিযান বন্ধ ছিল। আবার ১৯৭০ সালে অভিযান আরম্ভ হয়। ১৯৭৩ সালে জাপানীরা বর্ষার পর অক্টোবর মাসে সাফল্য পান। ১৯৭৪ সালই শেষ বছরে যে বার কেউই শিখরে উঠতে পারেননি। এরপর কেবল লাগাতার সাফল্য। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের কীর্তি।

১৯৭৫ সালে জাপানের জুনকো টাবেই প্রথম মহিলা এভারেস্টার। ১৯৭৮ সালে রাইনহোল্ড মেসনার ও পিটার হাবেলার প্রথম অক্সিজেন ছাড়াই শিখরে চড়েন। ১৯৮০ সালে মেসনার আবার সাফল্য পান, এবার সম্পূর্ণ একক প্রচেষ্টায়। ওই বছরই পোল্যান্ডের ওয়েলিকি প্রথম শীতকালে চূড়ায় উঠতে সক্ষম হন। ১৯৯০ সালে স্লোভেনিয়ার স্বামী-স্ত্রী আন্দ্রে ও মারিয়া স্ট্রমফেল একসঙ্গে শিখরে আরোহণ করেন। ওই বছরই ফ্রান্সের পিতা-পুত্র জুটি জাঁ নোয়েল ও বার্ট্রান্ড রোচে একসঙ্গে শিখরে চড়েন। অন্যান্য বিখ্যাত সফল আরোহণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হিলারির ছেলে পিটার হিলারি (১৯৯০), ম্যালরির নাতি জর্জ ম্যালরি (১৯৯৫) আর তেনজিং-এর ছেলে জামলিং তেনজিং (১৯৯৬)। ২০০৩ সালে ৭০ বছর বয়সী জাপানের ইউচিও মিউরা এভারেস্টে চড়েন, আবার সে বছরই সর্বকনিষ্ঠ হিসেবে নেপালের শেরপা মেয়ে মিংমা কিপা ১৫ বছর বয়সেই এই সাফল্য পান।

সেকালের শেরপা : ডা নামগিয়াল ও আং থার্কে

এভারেস্টের কাহিনি একান্তই অসম্পূর্ণ শেরপাদের কথা ছাড়া। শেরপারা দক্ষিণ তিব্বত আর উত্তর-পূর্ব নেপালের বাসিন্দা। ১৯২১ সালে কেলাস সাহেব প্রথম তাদের সম্বন্ধে সার জগৎকে অবহিত করেন, সেই থেকে শেরপাদের ছাড়া হিমালয় অভিযান কল্পনাই করা যায় না। ২৫,০০০ ফুটের বেশি উচ্চতায় মাল বয়ে টাইগার সম্মান বা পদক পেতেন ওস্তাদ শেরপারা। তেনজিং-এর আগেও শেরপা সর্দার আং শেরিং, আং থার্কে বা ডা নামগিয়াল খ্যাতি অর্জন করেছেন, তবে দুনিয়াজোড়া নাম করেন প্রথম তেনজিং। তাঁর পর সে সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন নাওয়াং গোম্বু, সোনাম গিয়াৎসো, আং কামি-রা। আর সাম্প্রতিককালে প্রায় সব রেকর্ডই গড়েছেন শেরপারা। নো টেম্বো (১৯৯৩ সালে ৪ বার এভারেস্ট চড়েছেন), আং রিটা (১৯৯৬ সালের মধ্যে ১০ বার আরোহণ), বাবু ছিরি শেরপা (১৯৯৯ সালে

এভারেস্ট শিখরে ২১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট), আপা শেরপা (২০০৩ সালের মধ্যে ১৩ বার শিখরে), কুশাং দোরজে (চারটি বিভিন্ন পথে আরোহণ), লাকপা গেলু শেরপা (বেস ক্যাম্প থেকে দ্রুততম আরোহণ ১০ ঘণ্টা ৫৬ মিনিটে)। আং রিটা, বাবু ছিরি, আপা বা লাকপা ছাড়াও অন্তত ৫ বার এভারেস্টে চড়েছেন আরো ২২ জন শেরপা। ভাবা যায়? এভারেস্টে যাঁরা চড়েছেন তাঁদের শতকরা ৩০ ভাগই শেরপা আর যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের শতকরা ৪০ ভাগ।

ম্যালরির দেহের সঙ্গে আবিষ্কৃত জিনিসপত্র (১৯৯৯)

এই সাফল্যের খতিয়ানের মধ্যে দুটি অভিযানের উল্লেখ করা বিশেষভাবে দরকার। ১৯৯৯ সালে মার্কিনি অভিযাত্রী কনরাড অ্যাঙ্কার ৭৫ বছর বাদে খুঁজে পান ম্যালরির দেহ। ২০০২ সালে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক পত্রিকার আয়োজিত স্বর্ণজয়ন্তী অভিযানে চূড়ায় পা রাখেন দুই সফল এভারেস্টার-এর পুত্র পিটার হিলারি ও ব্রেন্ট বিশপ, বেস ক্যাম্প থেকে ব্যবস্থাপনা দেখছিলেন জামলিং নোরগে। এই অভিযানের তোলা ফিল্ম ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেলের মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে দেখানো হয়েছে এভারেস্ট আরোহণের স্বর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে।

শেষের কথা

সব মিলিয়ে গত ৫০ বছরে পরিবর্তন ঘটেছে অনেক। এখন প্রতি বছরই অন্তত ১০০ জন এভারেস্ট শিখরে উঠছেন, ২০০১ সালে উঠেছিলেন ১৮২ জন। ২০০২ সালের ১৬ মে একদিনে ৫৪ জন শিখরে উঠেছেন। আর এবছর? স্বর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে বর্ষার আগেই ২৩টি অভিযান হয়ে গেছে, ভারত-নেপাল যৌথ অভিযানের ২৭ জন পা রেখেছেন শিখরে। আমেরিকায় ৬৫,০০০ ডলার খরচ করলে এভারেস্টে চড়ার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে। ব্যাপারটা অনেকটা প্যাকেজ ট্যুরের মতনই দাঁড়িয়ে গেছে। এভারেস্টকে বলা হত দ্য আল্টিমেট অ্যাডভেঞ্চার— সে অ্যাডভেঞ্চার কি তবে হারিয়ে যাবে?

এর মধ্যেও অবশ্য বিপদ আছে, ১৯৯৬ সালে খারাপ আবহাওয়ায় একসঙ্গে ১৫ জন মারা যান, এটিও একটি রেকর্ড। সব মিলিয়ে দেখলে অবশ্য সাফল্যের তুলনায় মৃত্যুর খতিয়ান এভারেস্টের ক্ষেত্রে কমই। ২০০০ সাল পর্যন্ত এভারেস্টে সফল আরোহনের সংখ্যা ১১৭২, মৃত্যু ১৬৫, মৃত্যুর হার শতকার ১৪ ভাগ। তুলনায় এই হার কাঞ্চনজংঘা, কে-২, নাঙ্গা পর্বতে শতকরা ২৫ থেকে ৩৩ ভাগ, অন্নপূর্ণাতে শতকরা ৫০। সুতরাং এভারেস্টে চড়াই সে সবচেয়ে শক্ত তার সঠিক প্রমাণ নেই। একথা মনে রাখা দরকার যে ৮০০০ মিটারের বেশি উঁচু শৃঙ্গগুলির মধ্যে কেবল অন্নপূর্ণা (১৯৫০) আর নাঙ্গা পর্বত (১৯৫৩) পরাজিত হয়েছে এভারেস্টের আগে, অন্য

অভিমানে শেরপাদের দল

শৃঙ্গগুলিতে অভিযাত্রীদের পা পড়েছে ১৯৫৪ থেকে ১৯৬৪ সালের মধ্যে।

বিপদের কথা ছাড়াও এখন পরিবেশবিদরা বিশেষ শঙ্কিত এভারেস্ট অভিযান নিয়ে। বিভিন্ন অভিযান পাহাড় চূড়ায় রেখে এসেছে পরিত্যক্ত তাঁবু, জলের বোতল, খাবারের টিন, অক্সিজেন সিলিন্ডার, আরো কত কী! অন্তত ১২০টি মৃতদেহ আজও পড়ে আছে পথের পাশে বরফের তলায়। এখন এভারেস্ট অঞ্চল পরিষ্কার করতেই বার বার অভিযানে পাঠাতে হচ্ছে, গত তিনটি অভিযান তিন টনেরও বেশি আবর্জনা নামিয়ে এনেছে। তা নইলে কীভাবে রক্ষা পাবে 'দেবতাত্মা' হিমালয়ের সর্বোচ্চ চূড়ার অমলিন গৌরব!

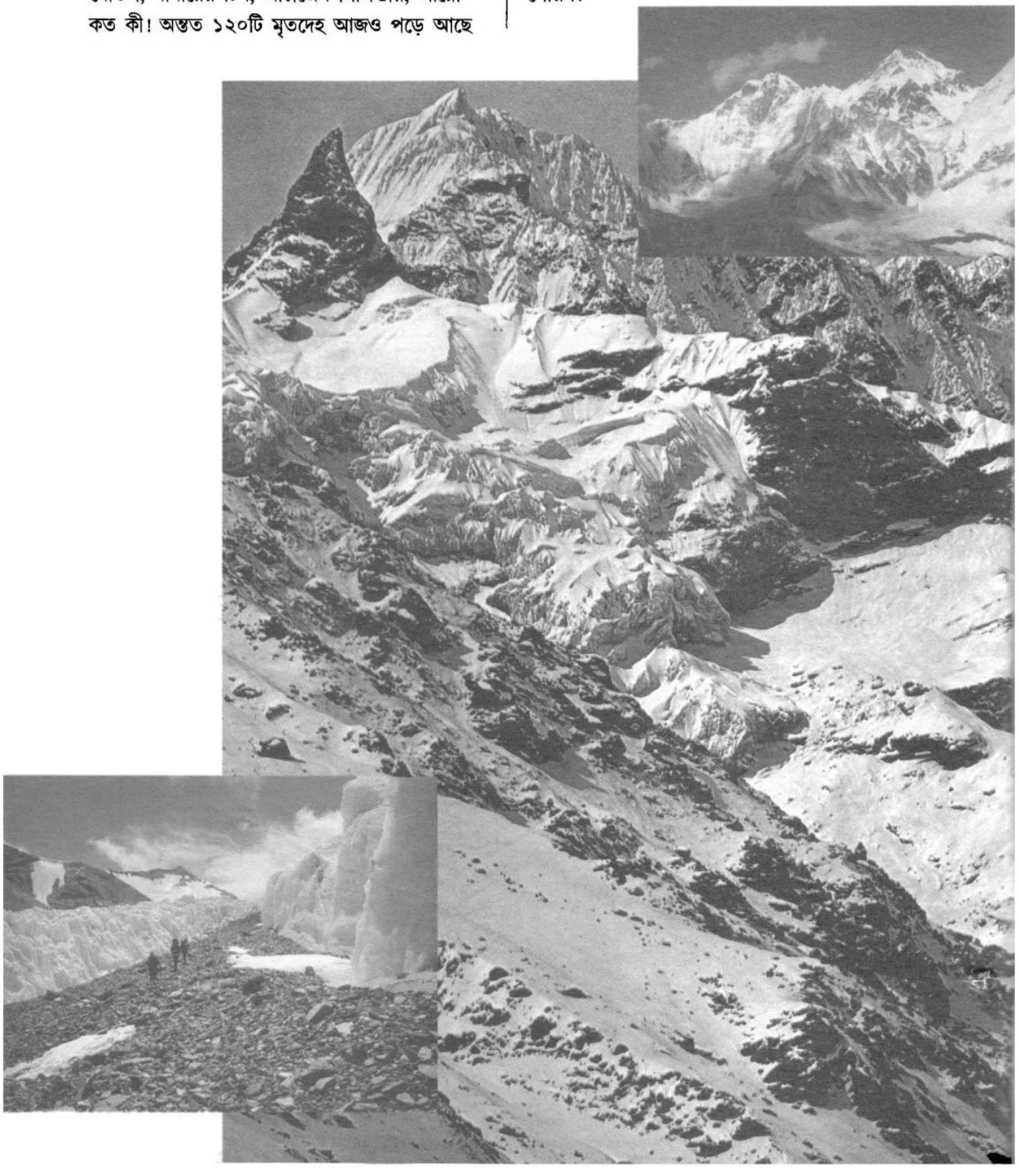

কমান্ডার বোস

কল্পনা ও ছবি - গৌতম কর্মকার

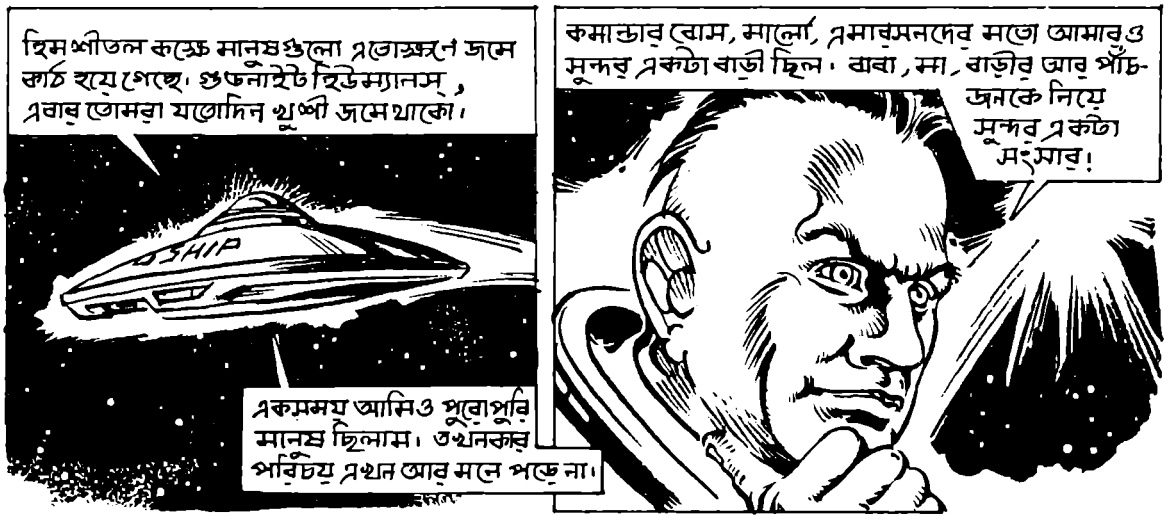

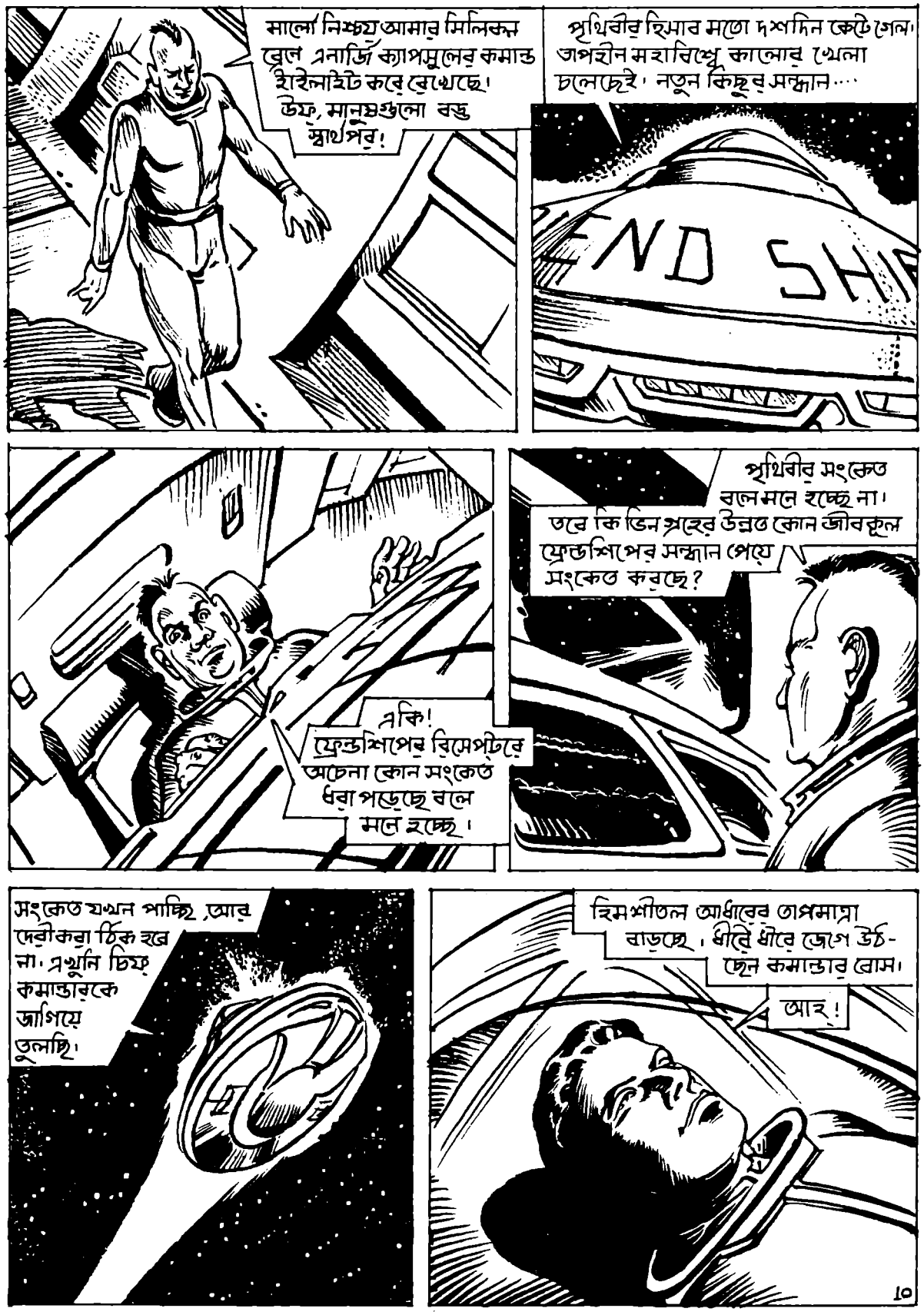

মার্লো নিশ্চয় আমার সিলিকন ব্রেনে এনার্জি ক্যাপসুলের কমান্ড হাইলাইট করে রেখেছে। উফ্, মানুষগুলো বড্ড স্বার্থপর!
পৃথিবীর হিসাব মতো দশদিন কেটে গেল। তাপহীন মহাবিশ্বে কালোর খেলা চলেছেই। নতুন কিছুর সন্ধান…
END SH
একি! ফ্রেন্ডশিপের রিসেপ্টরে অচেনা কোন সংকেত ধরা পড়েছে বলে মনে হচ্ছে।
পৃথিবীর সংকেত বলে মনে হচ্ছে না।
তবে কি ভিন গ্রহের উন্নত কোন জীবকুল ফ্রেন্ডশিপের সন্ধান পেয়ে সংকেত করছে?
সংকেত যখন পাচ্ছি, আর দেরী করা ঠিক হবে না। এখুনি চিফ্ কমান্ডারকে জাগিয়ে তুলছি।
হিমশীতল আধারের তাপমাত্রা বাড়ছে। ধীরে ধীরে জেগে উঠছেন কমান্ডার বোস।
আহ্!
10

কী খবর ডঃ-স্ফিংস্, নতুন কোন গ্রহ... ?
না স্যার, নতুন গ্রহ নয়...
আমরা অচেনা একটা সংকেত ধরতে পেরেছি।
অচেনা সংকেত, আশ্চর্য!
ডাঃ স্ফিংস্ - মার্লো এবং এমারসনকে এখুনি জাগিয়ে তুলুন। মনে হচ্ছে নতুন কিছু ঘটতে চলেছে।
FRIE
মার্লো, এমারসন - দেখো মহাবিশ্বে আমরা নিঃসঙ্গ নই। আমাদের মতো কিংবা আমাদের চেয়ে...
বুদ্ধিমান মস্তিষ্কের মুখোমুখি হতে চলেছি আমরা।
সংকেত অনুসরণ করে ফ্রেন্ডশিপকে নিয়ন্ত্রণ করুন ডাঃ স্ফিংস।
দেখুন, দেখুন স্যার যন্ত্র কি বলছে। আমাদের সামনে আটটি গ্রহ নিয়ে একটি নক্ষত্রের সুন্দর সংসার।
11

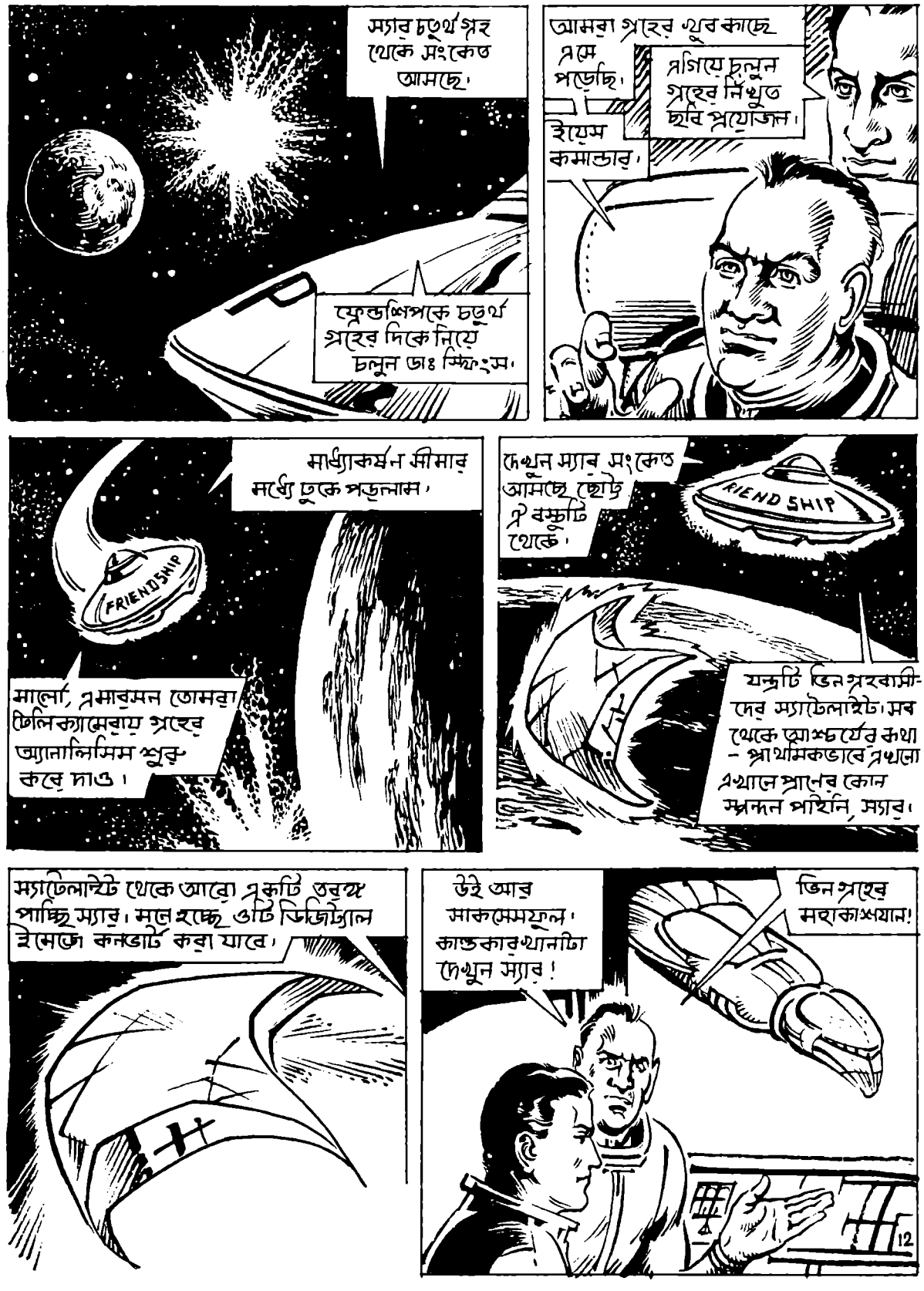

স্যার চতুর্থ গ্রহ থেকে সংকেত আসছে।
ফ্রেন্ডশিপকে চতুর্থ গ্রহের দিকে নিয়ে চলুন ডাঃ স্ফিংস।
আমরা গ্রহের খুব কাছে এসে পড়েছি।
এগিয়ে চলুন গ্রহের নিঁখুত ছবি প্রয়োজন।
ইয়েস কমান্ডার।
মাধ্যাকর্ষন সীমার মধ্যে ঢুকে পড়লাম।
FRIENDSHIP
মার্লো, এমারসন তোমরা টেলিক্যামেরায় গ্রহের অ্যানালিসিস শুরু করে দাও।
দেখুন স্যার সংকেত আসছে ছোট্ট ঐ বস্তুটি থেকে।
FRIEND SHIP
যন্ত্রটি ভিনগ্রহবাসীদের স্যাটেলাইট। সব থেকে আশ্চর্যের কথা - প্রাথমিকভাবে এখনো এখানে প্রানের কোন স্পন্দন পাইনি, স্যার।
স্যাটেলাইট থেকে আরো একটি তরঙ্গ পাচ্ছি স্যার। মনে হচ্ছে ওটি ডিজিট্যাল ইমেজে কনভার্ট করা যাবে।
উই আর সাকসেসফুল। কান্ডকারখানাটা দেখুন স্যার!
ভিন গ্রহের মহাকাশযান!
12

(ক্রমশ)

দিগ্‌বিজয়ী কোকোর কাহিনি

ঋতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্যাডবেরি— নামেই কার না জিভে জল আসে? আর রাংতায় মোড়া আসল জিনিসটি হাতে পেলে তো আর কথাই নেই— তাই না? এই ক্যাডবেরি নামটি কিন্তু আসলে ছিল এক ইংরেজ মুদির— পুরো নাম জন ক্যাডবেরি। এই জন ক্যাডবেরি, কোকো পাউডারকে নানারকম সুস্বাদু উপায়ে চকোলেটের রূপ দিয়ে সবাইকে এমনই মজিয়ে দিয়েছেন যে ক্যাডবেরি আর চকোলেট প্রায় সমার্থক হয়ে উঠেছে। ক্যাডবেরি যে আদতে একজন বিশেষ মানুষের নাম ছিল তা আমরা প্রায় ভুলতেই বসেছি।

প্রথমে কোকোর ইতিহাস একটু জানা যাক। এই কোকো তৈরি হয় কাকাও গাছের বীজ থেকে। এতে প্রচুর পরিমাণে স্নেহজাতীয় ও প্রোটিন পদার্থ থাকে। যে-জন্যে চা বা কফি খেলে চনমনে লাগে, সেই ক্যাফিনও কিছু পরিমাণে থাকে ওই 'কাকাও' বীজে। এই কাকাও গাছ আসলে জন্মাত দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন জায়গায়, যেমন— অ্যামাজন উপত্যকায়, ওরিনোকো নদীর উপত্যকায়। মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা ছাড়াও বর্তমানে প্রধানত পশ্চিম আফ্রিকা এবং শ্রীলঙ্কায় এ গাছের প্রচুর চাষ হয়।

আমেরিকার প্রাচীন আদি-বাসিন্দা এ্যাজটেকরা ইউরোপের সভ্যজগৎ জানবার বহু আগেই, চকোলেটের অস্তিত্ব জানত। গোলা চকোলেট তাদের অত্যন্ত প্রিয় পানীয় ছিল। স্পেনদেশিয় আবিষ্কারক কোর্তে ষোড়শ শতকে মেক্সিকো দেশে গিয়ে এ্যাজটেকদের মধ্যে এই পানীয়ের খুব প্রচলন দেখেন, কিন্তু মিষ্টি দিয়ে এত সুস্বাদু করে তারা খেতে জানত না। তবে কাকাও গাছের ফলের ভিতরের বীজ দিয়ে চকোলেট বানাবার পদ্ধতি তারা ভালোই জানত। এই ফলগুলো অনেকটা তুলো গাছের ফলের মত দেখতে তবে আকারে আরও বড়ো।

অষ্টাদশ শতকের উদ্ভিদবিজ্ঞানী লিনিয়াস এই পানীয় খেয়ে মুগ্ধ হয়ে গাছের বৈজ্ঞানিক নামকরণ করেন 'থিয়েব্রোমা' অর্থাৎ 'দেবতাদের খাদ্য'। কলম্বাস কাকাও গাছের ফল সঙ্গে করে স্পেন দেশে নিয়ে যান। পরবর্তীকালে ফরাসি রাজদরবারে চকোলেট ক্রমে ক্রমে সেরা, তথা অতিপ্রিয় পানীয় হয়ে ওঠে। সঠিক যে কবে থেকে চিনি মেশানো শুরু হল তা বলা যায় না, তবে ইংল্যান্ডে মিষ্টি চকোলেট-গোলা পানীয়ই যায় এবং সেখানেও মানুষ তা সাদরে গ্রহণ করে। তা এমন সুস্বাদু জিনিস মানুষ খুশি হয়ে গ্রহণ করবে না তো কী? বিখ্যাত ক্যাডবেরি ঘরানা শুরু হয় ১৮৩১ নাগাদ। কেবল ফ্রান্স, স্পেন বা ইংল্যান্ডেই নয়, তামাম ইউরোপই চকোলেটের রসে মজে যায়। বলা চলে একরকম, 'চকোলেট-দিগ্‌বিজয়' শুরু হয়ে যায়। ইংল্যান্ডে চকোলেট-প্রীতি ক্রমশ এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে ওই সময়ে ক্লাব-টাবে খানা-পিনার প্রথম শুরুটা হত চকোলেট-পান করে।

কাকাও গাছের বীজ থেকে কোকো-পাউডার প্রথম তৈরি করেন ভ্যান হোর্টেন নামের এক ওলন্দাজ, ১৮২৮ সালে। তিনি বীজগুলো নিষ্পেষণ করে তাদের ভিতরের তৈলাক্ত অংশ বের করে দিয়ে শুকনো কোকোগুঁড়ো বানাবার কৌশল উদ্ভাবন করেন। তারপর তিনি কোকো-গুঁড়োর সঙ্গে কিছু পরিমান ময়দা কিংবা এ্যারারুট মিশিয়ে একে লঘুপাচ্য করে তোলেন। তবে একথা অনস্বীকার্য, জন ক্যাডবেরিই চকোলেটকে পাইয়ে দিয়েছেন বিপুল জনপ্রিয়তা। চকোলেট-স্ল্যাব ঊনবিংশ শতাব্দীদেই প্রচলিত হয়।

কোকো-মাখন এক সময়ে সাবান বানানোতেও ব্যবহৃত হত। কাকাও বা থিয়োব্রোমা কাকাও চিরসবুজ গাছ। উচ্চতায় ১৫-২০ ফুট পর্যন্ত হয়। গাছে প্রথম ফল ধরতে প্রায় ৫ থেকে ৮ বছর অবধি লেগে যায়। তারপর আর দেখতে হয় না— একেবারে অজস্র ফল ধরে। এক-একটা ফল প্রায় ৭ থেকে ১০ ইঞ্চির মধ্যে হয় আর এক-একটা ফলের ভিতর থাকে প্রায় ৪০ থেকে ৬০টি অবধি বীজ। এই ফলগুলো কাঁচা অবস্থায় সবুজ থাকে, পাকা অবস্থায় ক্রমশ হল্‌দে, তারপর বেগুনেটে বাদামি হয়ে যায়। মাঝে মাঝে গায়ে উঁচু উঁচু শিরা থাকে। গাছের একেবারে গুঁড়ির কাছে থেকেই ফল ধরে, যেমন কাঁঠালের হয়।

ফলগুলো দেখতে হুবহু না হলেও খানিকটা কামরাঙার মতো বলা চলে। বীজ বের করার পরে কিছুদিন পচিয়ে ফেলে রাখা হয় তিত্‌কুটে স্বাদটা কমাবার জন্যে। তারপর সেগুলোকে বেশ করে শুকনো আর মচমচে করে তোলা হয়। রং-ও হয়ে আসে তখন গাঢ় খয়েরি। তখন বীজগুলো কারখানায় সেঁকা হয়। সেঁকবার পর তাদের ছোটো ছোটো টুকরোয় ভাঙা হয় এবং সেগুলো খোসা থেকে বাছাই করে আলাদা করা হয়। এবার ছোটো টুকরোগুলো আবার মেশিনে মিহি করে গুঁড়ো করা হয়। টুকরোয় টুকরোয় ঠোকাঠুকি বা সংঘর্ষের ফলে যে-তাপ সৃষ্টি হয়, তাতে বীজের ভিতরকার তেল গলে বেশ একরকম চটচটে তরল পদার্থের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন ধরনের বীজের টুকরোগুলির সংমিশ্রণে আরও উপাদেয় ঘ্রাণ তৈরি হয়। এর পরেও আরো অনেক রকম প্রক্রিয়ার পর, যে-চকোলেট আমরা দোকান থেকে কিনে খাই, তা ওই রকম আকার ধারণ করে। চকোলেট 'স্ল্যাব' তৈরির জন্যে ওই মিশ্রণ, যন্ত্রচালিত ছাঁচে ঢেলে দেওয়া হয়। সেখানে ঠান্ডা হয়ে জমে গেলে ছাঁচ থেকে তুলে নেওয়া হয়।

চকোলেটের উপর মিল্ক চকোলেট লেখা নিশ্চয় চোখে পড়েছে? মিল্ক চকোলেটে বাড়তি গুঁড়ো দুধ অথবা টাটকা মাঠাওয়ালা দুধ মেশানো হয় স্বাদ বাড়াবার জন্যে। তাছাড়া বিস্কুটের উপর চকোলেটের পুরু প্রলেপ দেওয়াও হয় বৈচিত্র্যের খাতিরে। এখন আরো কত বিভিন্ন ঘ্রাণের চকোলেটও পাওয়া যায়। কারোর কারোর আবার তেতো চকোলেট মহা পছন্দ! তা-ও তৈরি হয়, তবে কম।

আকছার কেনা এবং পাওয়া চকোলেটের পিছনে যে এত কথা ছিল, তা কে জানত? তবে একটা ভারী গোপন কথা এই ফাঁকে বলে দিই। চকোলেট তৈরির কারখানা দেখাতে না পারলেও একটা বড় কোকো-পড দেখাতে পারি। এই ফলটা সুদূর নাইজিরিয়া থেকে কলকাতায় আমার কাছে এসে পৌঁছেছে এত লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে—আমি চকোলেট-প্রেমী বলে। ভাবছি ফলটা ভেঙে বীজ বের করে পুঁতে গাছ করলে কেমন হয়? যদি সুলভে চকোলেট পাওয়া যায়, তবে মন্দ হয় না।

উনিশ শতকের ইংল্যান্ডে চকোলেটের বিজ্ঞাপন

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ভ্যাটনাজোকুলের আতঙ্ক

তুর্কু ইউনিভার্সিটির প্লান্ট সায়েন্স ডিপার্টমেন্টে, জেনেটিকসের একটা আন্তর্জাতিক ওয়ার্কশপ অ্যাটেন্ড করতে গিয়ে, পিরজো কারুনেসের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ও এখন অধ্যাপনা ছেড়ে আইসল্যান্ডের অ্যাকরানেস বলে এক বন্দর শহরে মাছের ব্যবসা করছে। আইসল্যান্ডের রাজধানী রেইকজাভিক থেকে দূরত্ব প্রায় পঞ্চাশ কিমি। কারুনেসের উন্নতির মান উল্লেখযোগ্য। সাত-আটটা ছোট-বড় জাহাজের মালিকানা, এছাড়া মাছ ধরার বড় বড় ট্রলার আছে অনেকগুলো।

'বাসু, তোমার কথা বলো', ভাঙা ভাঙা ইংরাজিতে কথা বলার অভ্যাস কারুনেসের।

'আমার কথা কী আর বলব? কলকাতার একটা কলেজে পড়িয়ে রুটি জোগাড় করছি।'

'তোমাকে তো বলেছি ওসব ছেড়ে দিয়ে চলে এসো আইসল্যান্ডে, ফিসিং ব্যবসা করব।'

আমি হাসলাম।

'তোমাকে এবার আমি ছাড়ব না, সঙ্গে করে নিয়ে যাব। আমার ব্যবসা-বাণিজ্য দেখবে। তোমার পছন্দ হলে, আমার সাথে কাজ করবে,' ঢুলু-ঢুলু চোখে কারুনেসের কথা জড়িয়ে যাচ্ছে।

আজি রাজি হলাম, অবশ্য রাজি না হয়ে উপায় নেই। কারুনেস ভদকা গিলেছে গলা পর্যন্ত। ওর এই একটা দোষ, গলা পর্যন্ত মদ না খেলে ওর চলে না। ফিনল্যান্ডের অধিকাংশ লোকই অবশ্য ভদকাপ্রেমী। এরা আবার রাশিয়ানদের থেকেও বেশি ভদকা পান করে থাকে। আর একটা জিনিসের উপর এদের দুর্বলতা আছে। তা হল কফি। সারা দিনে কম করে পাঁচ কাপ কফি ওরা খাবেই।

সেমিনার সারা হলে তুর্কু ঘোরার একটা পরিকল্পনা ছিল। কারুনেস কিন্তু আমাকে ছাড়েনি। আমার সঙ্গে ওঠা, বসা, ঘোরা। মনে হচ্ছে এবার আমাকে আইসল্যান্ডে নিয়ে যাবেই যাবে। তুর্কুর দর্শনীয় জিনিস হল সুন্দর সুন্দর লেক আর পাইন, স্প্রুস, বার্চের অরণ্য।

*

কারুনেসের ফিনল্যান্ড ভ্রমণের তিনটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমত, মৎস্য-বাণিজ্য, ইতিমধ্যে তা সারা হয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত, জেনেটিক্সের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান আর তৃতীয়ত, ওর মাছের ব্যবসায়ে কাজে লাগানোর

জন্যে কিছু কর্মঠ 'ল্যাপ' জোগাড় করা। 'ল্যাপ' হল কিছুটা যাযাবর শ্রেণীর লোক। ওদের ছোটোখাটো কর্মঠ চেহারা। এরা মাছ ধরার ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত। সম্ভবত ২০০০ বছর আগে এরা উত্তর রাশিয়া থেকে এই সমস্ত দেশে বসবাস করতে আসে। এরা 'সারমি' ভাষায় কথাবার্তা বলে। এই ভাষার সঙ্গে ফিনিশ ভাষার সাদৃশ্য দেখা যায়। কারুনেস অবশেষে স্থানীয় ঠিকাদার মারফত জনা পনেরোর একটা দলকে নিজের জাহাজে তুলতে সক্ষম হল। কারুনেসের জাহাজের নাম ভ্যাটনাজোকুল। এটা আইসল্যান্ডের একটা বড়োসড়ো আইস ক্যাপের নাম। ১৯৯৬ সালে আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতে ওই আইস ক্যাপের প্রভাবে বড়সড় বিপর্যয় ঘটে গেছে। আইসল্যান্ডের বিস্তৃত জায়গা জলপ্লাবিত হয়েছিল। যেমন জাহাজের নাম, তেমনই তার বরফসাদা রং। যদিও মাছ চালানের জাহাজ, তবু ভেতরটা পরিষ্কার, ছিমছাম। কারুনেস ক্যাপটেনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। মি. জি. এফ. বক্সটন। কানাডার লোক। ভাগ্যের ফেরে জাহাজের ক্যাপ্টেন।

কারুনেসের সম্বন্ধে যথোপযুক্ত প্রশংসাবাক্য বলার পর বক্সটন আমার সঙ্গে হাত মেলালেন। কারুনেস বলল যে, বক্সটন আসলে একজন 'প্রকৃতিপ্রেমিক'। কারুনেসের ঘরের সংলগ্ন ঘরটি আমাকে দেওয়া হল। ঘরে স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব নেই। ফায়ার প্লেস, কুলার থেকে আরম্ভ করে যাবতীয় স্বাচ্ছন্দ্যের সব কিছু আছে। বাল্টিক সমুদ্রের উপর দিয়ে জাহাজ চলেছে। আমি আর কারুনেস ডেকে বসে সামুদ্রিক শোভা দেখতে দেখতে আলাপ-আলোচনা করছি। কারুনেস অভ্যাসবশত কফিতে চুমুক দিয়ে যাচ্ছে। ওর কথা শুনে জানা গেল জাহাজে ক্যাপ্টেন, সহকারী ক্যাপ্টেন, মেরিন ইনজিনিয়ার, অফিসার ও অন্যান্য সব মিলে আছে ৫০ জন, আর আমাকে নিয়ে হল ৫১। রাত্তির বেলায় নীচের ডেক থেকে হুল্লোড়ের শব্দ পাচ্ছিলাম। কোন ধাতব যন্ত্র বাজিয়ে ল্যাপগুলো ফিনিশ ভাষায় কোনো পপুলার গান গাইছে। বালিশে কান পেতে ওদের হুল্লোড় শুনতে শুনতে কখন যে ঘুমিয়ে পরেছি টের পাইনি।

*

সকালবেলায় শোরগোল শুনে চটপট স্লিপিং গাউনটা গায়ে চড়িয়ে, স্লিপার পায়ে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। কারুনেস বিভ্রান্তের মতো ছটফট করছে। আমাকে দরজা খুলতে দেখে একরকম ছুটে আমার কাছে এসে বলল, 'বাসু আমার জাহাজে একটা খুন হয়েছে।'

কারুনেসের সঙ্গে নীচে স্টোর হাউসের সামনে এসে দাঁড়ালাম। ভ্যাটনাজোকুলের সেকেন্ড অফিসার জে. জে. স্যামজোস-এর মুণ্ডহীন দেহটা পড়ে রয়েছে। আশেপাশে জাহাজের কিছু কর্মচারী ভিড় করে দেখছে। জাহাজের সিকিউরিটি অফিসারকে বেশ চিন্তিত মনে হল। ভদ্রলোক এ-ব্যাপারে নিশ্চিত যে, খুনটা করেছে জাহাজেরই কোনো একজন। স্যামজোস যে-ধরনের হাসিখুশি, ঠান্ডা মাথার ভালো লোক ছিলেন, ওর কোনো শত্রু থাকতে পারে তা ভাবাই যায় না। আজকের দিনটা সিকিউরিটি অফিসারের কাছে মোটেই ভালো দিন ছিল না। রাত্রি পর্যন্ত তদন্তের স্বার্থে দফায়-দফায় জেরার কাজ করতে হয়েছে। আমাকেও উনি জেরার হাত থেকে বাদ দিতে পারেননি। 'ল্যাপ'দের জেরা করা ওঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। ওরা লাশটাকে দেখার পর থেকে ভীষণ চুপ হয়ে গেছে। ওদের মুখে চোখে ভয়ের ভাব। জড়সড় হয়ে বসে কেবিনের ধারে ওরা রাতের খাবার সারছিল। মধ্যরাত্রিতে আমাদের জাহাজ ডেনমার্কের পাশ ঘেঁষে উত্তর সাগরে পড়ল। ইনটারনেটে স্যামজোস-এর পরিবারের কাছে খবর পাঠানো হয়েছে। ওর দেহটা ডিপ ফ্রিজে রেখে দেওয়া হয়েছে। ঘরটা সিকিউরিটি অফিসার সিল করে দিয়েছেন, পরে পুলিশি তদন্তের সুবিধার জন্যে।

*

সকালে যখন ক্যাপ্টেনের মুণ্ডহীন ধড়টা ক্যাপ্টেনের ঘরেই পাওয়া গেল, তখন উৎকণ্ঠার আর শেষ রইল না। ছোটো সাজানোগোছানো কেবিনের মেঝেতে কার্পেট বিছান। কার্পেটের উপর বক্সটনের মুণ্ডহীন ধড়টা পরে আছে। কী ভয়ানক দৃশ্য! ক্যাপটেনের ঘরের সমস্ত জিনিসই সুন্দরভাবে সাজানো রয়েছে। জানলার পাশে টবে দুটো সুন্দর অর্কিড ঝুলছে। একটাতে অদ্ভুত সুন্দর ফুল ফুটে আছে। কারুনেস ভীষণ ভেঙে পরেছে। আমার তো ভীষণ খারাপ আর ভয়ও লাগছে। সিকিউরিটি অফিসারের জেরা করার ধরন এবং আরো অনেকের আমার দিকে বিশেষ দৃষ্টিতে তাকানো দেখে নিজেকে অপরাধী-অপরাধী মনে হচ্ছে। দুপুর দুটোর সময় হঠাৎ করে তুর্কু থেকে ই-মেল-এ মি. ম্যাকরে বলে এক ভদ্রলোক একটা মেসেজ পাঠালেন কারুনেসের নামে। মেসেজটা পড়ে কারুনেসের মুখটা থমথমে হয়ে উঠল। আমি কারুনেসকে জিজ্ঞাসা করতে ও বলল, 'বাসু, ঘোরতর

সমস্যায় পড়েছি।' আমি বললাম, 'সমস্যাটা বলো, সকলে মিলে সাহায্য করার চেষ্টা করব।'

কারুনেস যা বলল তাতে বুঝলাম সত্যি আমরা ভয়ংকর সমস্যায় পড়েছি। মি. ম্যাকরে হলেন সেই ঠিকাদার যার কাছ থেকে কারুনেস ওই ১৫ জন ল্যাপকে ভাড়া করেছে। ম্যাকরে জানাচ্ছেন ওই ল্যাপগুলোর মধ্যে একজনের সাইকোপ্যাথিক রোগ আছে। সে রাত্রি হলেই ভয়ংকর খুনিতে রূপান্তরিত হয়। সামনে যাকে পায়, তার মুণ্ডু ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। দিনের বেলায় তার স্বাভাবিক আচরণ দেখে তাকে চেনা যাবে না। এমনকি আসামি নিজেও বুঝতে

পারে না। কারুনেস আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

কীভাবে আমি ওকে সাহায্য করতে পারি?

বিকেল ঠিক তিনটের সময় সিকিউরিটি অফিসার হন্তদন্ত হয়ে এসে হাজির। 'স্যার বলেন তো ল্যাপগুলোকে একটা ঘরে পুরে তালা লাগিয়ে দিই।' কারুনেস বলল, 'না, তা হয় না, তাহলে ওদের মধ্যে এক বা একাধিক জন খুন হতে পারে।' 'ইস্, যদি খুনিটাকে আলাদা করে চেনা যেত,' সিকিউরিটি অফিসার বললেন।

কারুনেস ছটফট করছে। আমার মধ্যেও অস্থিরতা। হঠাৎ আমি সিকিউরিটি অফিসারকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, আপনার কাছে কোন লাই-ডিটেক্টর মেশিন আছে?'

'হ্যাঁ, তা আছে। কিন্তু আমি তো সারমি ভাষা জানি না, কীভাবে আমি ল্যাপদের জেরা করব?' সিকিউরিটি অফিসারের গলায় অসহায় ভাব ফুটে উঠল। কারুনেস কথার সংযোজন করল, 'আর তা ছাড়া খুনি তো নিজেই জানে না, সে খুন করেছে।' আমি বললাম, 'কিন্তু সাক্ষী আছে এই খুনের। তাদের উপস্থিতিতে এই খুন হয়েছে। তারা যদি মিথ্যা না বলে, তবে আজ এই মুহূর্তেই খুনিকে চিনতে পারা যাবে। আর তা জানা খুবই জরুরি। কেননা রাত্রির আঁধার নামতে আর ক'ঘণ্টামাত্র বাকি।'

'সব ল্যাপদের একই রকম লাগে আমার, আপনার সাক্ষী এক লহমা দেখেই খুনিকে চিনে ফেলবে—' একথা সিকিউরিটি অফিসার বিশ্বাসই করতে চান না। আমিও জানি না কী ঘটবে। তবু পরীক্ষা করে দেখতে তো দোষ নেই। আমি সম্প্রতি ফ্রান্সের উনির-দ্য-এলআউট-এর অধ্যাপক থেলিয়ার এবং তার সহকর্মীদের কিছু কাজের কথা পড়ে বেশ উৎসাহিত হয়েছিলাম। এঁরা উদ্ভিদের স্মৃতিশক্তি এবং উপযুক্ত মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া এসব ব্যাপারে আলোকপাত করেছেন। বক্সটন জাহাজের ক্যাপ্টেন ছাড়াও একজন প্রকৃতিপ্রেমিক ছিলেন। এটা আশা করা যায়, তাঁর ঘরে রাখা দুষ্প্রাপ্য দুটো অর্কিডের পরিচর্যা তিনি নিজের হাতে করতেন। পরিচর্যার সঙ্গে সঙ্গে অর্কিডদুটোর উপর যে তাঁর ভালোবাসা ছিল, তা ফুলের ধরন দেখেই বোঝা যায়। আমি দুটো লাই ডিটেকটর যন্ত্রের ইলেকট্রোড দুটো ভিন্ন পাত্রে রাখা অর্কিডের পাতায় সংযোগ করলাম। জাহাজের সবাইকে একে একে ওই অর্কিডের সামনে দিয়ে যেতে বলা হল। আমি লাই ডিটেকটরের গ্যালভানোমিটারের কাঁটায় প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছিলাম। কারুনেস বললে, 'বাসু, তুমি অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ছ।'

আমি বললাম, 'এছাড়া আর উপায় নেই এখন।'

ঘড়ির কাঁটা আটটা ছাড়িয়ে গেছে। রাতের খাবার টেবিলের ঘণ্টা পরতে আধ ঘণ্টা মাত্র বাকি।

যখন বেঁটে-খাটো, শক্তপোক্ত চেহারার, মাথায় কদম ছাঁট চুল, আর গালে কাটা দাগ, আপাত-নিরীহ চেহারার একজন ল্যাপ অর্কিডের সামনে মার্চ করছিল, তখন দুটো লাই ডিটেকটরের গ্যালভানোমিটারের কাঁটায় বিশেষ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলাম। অনেকটা দীর্ঘস্থায়ী উৎকণ্ঠায় ভোগার পর আবার ভয় পেলে মানুষের যে-রকম ভয় হয় সে-রকম।

চোখের ইশারা করতেই সিকিউরিটি অফিসার ল্যাপটির ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল শিকারি বাঘের মতো। ল্যাপটি একলাফে ছুটতে শুরু করল স্টোর হাউসের দিকে। চার পাঁচজন একত্রে তাড়া করে ওকে ধরতে গেল। স্টোর হাউসের ঘর থেকে লুকিয়ে রাখা একটা ধারালো দা নিয়ে ও ছুটে আসছে। কারুনেসের হাতের রিভালবার গর্জে উঠল। গুলি খেয়ে ল্যাপটা ধারালো দা হাতে জাহাজের রেলিং টপকে সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিল। বিভীষিকার হাত থেকে মুক্তি পেল ভ্যাটনাজোকুল।

কারুনেস কফিতে চুমুক দিতে দিতে নিজের ঘরে নিয়ে আসা বক্সটনের অর্কিডের দিকে নরম চোখে তাকিয়ে বললে, 'বাসু, আমি ভাবছি মাছের ব্যাবসা ছেড়ে আবার পড়াশুনোর কাজে ফেরত যাব। আমি এবার গাছপালার মন নিয়ে পড়াশুনো করব। তুমি আমাকে সাহায্য করবে তো?'

কারুনেস ওর আন্তরিকতা-ভরা হাতের স্পর্শ দিয়ে আমার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল। আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই তুমি আমার সাহায্য পাবে।'

জাহাজ এখন নরওয়ে সাগর দিয়ে ভেসে চলেছে।

ঘুম, গভীর ঘুম নামছে চেখে।

ছবি : প্রণবেশ মাইতি

'চণ্ডাল'ই চ্যাম্পিয়ান

পাঁচ কথার প্যাঁচ

শুভেন্দু দাশমুন্সী

কথার খেই

কথা হচ্ছিল বাসের ভেতরে লেখা 'পকেটমার হইতে সাবধান', 'দিচ্ছি দিচ্ছি করিবেন না,' বা 'নামিবার সময় টিকিট দেখাইবেন' বনাম বাইরে লেখা 'দেখলে হবে খরচা আছে' বা 'দেখবি আর জ্বলবি, লুচির মতো ফুলবি' নিয়ে। বাংলা ভাষায় সাধু চলিতের চলতি দ্বন্দ্ব নিয়ে কথা বলতে বলতে দেখা গেল বাসের ভেতরের দেওয়ালে লেখা হয় সাধু বাংলা আর বাইরের গায়ে লেখা থাকে চলিত বাংলা।

কথারম্ভ

রিমঝিম বলল, 'অবশ্য বাসের ভেতরের লেখায় গুরুচণ্ডালি দোষও যে একেবারে নেই, তা কী করে বলছ?'

'কীরকম?' কালাচাঁদের প্রশ্ন।

'কেন, ওই যে 'দিচ্ছি দিচ্ছি করিবেন না' — ওটা কি গুরুচণ্ডালি নয়? পরে যখন 'করিবেন না' লিখছে, আগে তো তাহলে 'দিচ্ছি দিচ্ছি'র বদলে 'দিতেছি দিতেছি' বলা উচিত ছিল— না কি?'

'ধুস, সে আবার হয় না কি? বাসের প্যাসেঞ্জারের কাছে টিকিট চাইলে কি আর সে 'দিতেছি দিতেছি' বলবে? সে তো 'দিচ্ছি'ই বলবে। তাই ওটা ঠিক গুরুচণ্ডালি নয়। ও কথার যেন এক অংশে আছে বাসযাত্রীর মুখের কথা আর অন্য অংশে আছে বাসমালিকের লেখা সাধুভাষা।'

কালাচাঁদের এই সহজ সমাধান শুনে ভোলানাথবাবু খুব খুশি। ভোলানাথবাবু কালাচাঁদের পিঠ চাপড়ে বললেন, 'হ্যাঁ হে, এরকম হয় বটে। মনে করে দ্যাখো— আচ্ছা, মনে করে কাজ নেই এক্ষুনি দেখিয়ে শুনিয়ে তোমাদের চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভাঙছি। মুনশিজি, রবীন্দ্ররচনাবলিটা কোন আলমারিতে আছে?'

আমি আঙুল দিয়ে আলমারিটা দেখিয়ে দিলাম। ভোলানাথবাবু উঠে গিয়ে রচনাবলির দুটো খণ্ড বগলদাবা করে এনে বললেন, 'এই দ্যাখো, রবীন্দ্রনাথ একই বছরে একই সময়ে পাশাপাশি দুটো গল্প-উপন্যাস লিখছিলেন। একটা নবপর্যায় *বঙ্গদর্শন*-এ, আরেকটা *ভারতী*-তে। দুটোই ১৯০১ সালের এপ্রিল মাস থেকে বেরোচ্ছে। কিন্তু দুটোর মধ্যে ভাষার একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করে দ্যাখো।'

টেবিলের ওপর সবাই ঝুঁকে পড়ল। ভোলানাথবাবু *চোখের বালি* উপন্যাসের একটা পাতা খুললেন আর *গল্পগুচ্ছ* থেকে বের করলেন *নষ্টনীড়* গল্পটা।

'এই যে *বঙ্গদর্শন*-এ বেরোনো *চোখের বালি*-তে দ্যাখো আগে বিনোদিনীর সঙ্গে যখন মহেন্দ্রর বদলে অন্য একজনের বিয়ে হল আর বিয়ের কিছুদিনের মধ্যেই যখন বিনোদিনীর সেই স্বামী মারা গেল, তখন রবীন্দ্রনাথ লিখছেন : 'অনতিকাল পরেই কন্যা বিধবা **হইল**। মহেন্দ্র হাসিয়া **কহিল**, 'ভাগ্যে বিবাহ করি **নাই**, স্ত্রী বিধবা **হইলে** তো একদণ্ডও **টিকিতে পারিতাম** না।' বাক্যটা শুনে সবাই হেসে উঠল। ভোলানাথবাবু বললেন, 'এখানে গল্পের ভাষা আর সংলাপের ভাষা দুটোই সাধু। আর এবার 'নষ্টনীড়'-এ দ্যাখো, অমল তার বৌঠান মানে বৌদিকে বলছে :

> অমল **কহিল**, 'বৌঠান, আমাদের কালেজের রাজবাড়ির জামাইবাবু রাজ-অন্তঃপুরের খাসহাতের বুননি কার্পেটের জুতো **পরে আসে**, আমার তা সহ্য হয় না. একজোড়া কার্পেটের জুতো চাই, **নইলে** কোনোমতেই পদমর্যাদা রক্ষা **করতে পারছি নে**।'
>
> চারু। হাঁ, তা বৈকি! আমি **বসে বসে** তোমার জুতো সেলাই **করে মরি**। দাম **দিচ্ছি**, বাজার থেকে **কিনে আনো গে** যাও। অমল **বলিল**, 'সেটি হচ্ছে না।'

মজার ব্যাপারটা দ্যাখো, দুটোই কিন্তু পাশাপাশি লিখছেন, কিন্তু একটার সংলাপ আগাগোড়া সাধু, আরেকটার আগাগোড়া চলিত।'

রিমঝিম বলল, 'তার মানে আপনি বলছেন, 'নষ্টনীড়'-এর গদ্য যদি গুরুচণ্ডালি দোষ না হয় তাহলে 'দিচ্ছি দিচ্ছি করবেন না'-ও গুরুচণ্ডালি দোষদুষ্ট নয়!'

ভোলানাথবাবু একটু হেসে বললেন, 'শুনতে একটু কেমন লাগতে পারে — কিন্তু হ্যাঁ, তা-ই বলছি।'

কালাচাঁদ হঠাৎ তার বসবার মোড়াটা থেকে ফস করে মাটিতে নেমে বসে, হাত-টাত নেড়ে বেশ নাটুকে কায়দায় বলতে আরম্ভ করল :

> আমি তকনি **বলেছিলাম** কত্তামশায় আ-র এদেশে থাকা নয়, তা আপুনি **শুনলেন** না। কাঙালের কথা বাসি **হলে খাটে**।

তারপরেই আবার মোড়ায় চড়ে, হাতে হুঁকো খাওয়ার ভঙ্গি করে বলতে থাকল :

> বাপু হে দেশ ছেড়ে যাওয়া কি মুখের কথা? আমার এখানে সাত পুরুষে বাস। স্বর্গীয় কর্তামহাশয়রা যে জমি **করিয়া গিয়েছেন, তাহাতে** কখনো পরের চাকরি স্বীকার **করিতে হয় নাই**।

লাবণ্য এবার কালাচাঁদকে বললেন, 'বাহ্! চমৎকার! এতো দীনবন্ধু মিত্রর **নীলদর্পণ** নাটকের। খাসা তুলেছ তো কালাচাঁদ!'

সকলের চোখে প্রশংসা দেখতে পেয়ে কালাচাঁদ একটু লজ্জা পেয়ে বলল, 'আমি কিন্তু দিদি, এটা আমার অ্যাক্টিং দেখাবার জন্য করিনি। বলছিলাম, দেখুন দেখি প্রথমে চাষা সাধুচরণের ডায়লগটার সবটুকু চলিত আর তারপর জমিদার গোলক বসুর ডায়লগে সাধু— এটা কি গুরুচণ্ডালি নয়!'

'ওইত্তো, ওটাই তো মজা,' লাবণ্যদি বললেন, 'দ্যাখো, এই যে তোমরা গুরুচণ্ডালি-গুরুচণ্ডালি বলছ, একবারও তো ভাবছ না, কেনই এখনকার বাতিল সাধুকে গুরু বলব আর আমাদের আটপৌরে নিত্যব্যবহার্য চলিতকে চণ্ডাল বলে গাল পাড়ব? ব্যাপারটা দেখেছ, নাটকেও জমিদারের সংলাপ সাধু আর সাধারণ মানুষের সংলাপে চলিত। সেকালে ভাষা ব্যবহারের এই জাতবিচারটা কিন্তু বেশ ইন্টারেস্টিং।'

'ওরে বাবা— এ তো সাধু-চলিতের দ্বন্দ্ব থেকে একেবারে রীতিমত সামাজিক বিতর্ক আর দ্বন্দ্বের ব্যাপার-স্যাপার উঠে পড়ল।'— রিমঝিম রীতিমত উত্তেজিত।

'ভাষা নিয়ে কথা যখন, তখন চারপাশ তো জুড়ে জুড়ে যাবেই।'

লাবণ্যর কথায় মাথা নেড়ে বুলবুল এবার বলল, 'তা তো বটেই, তা তো বটেই। কিন্তু অন্য একদিক থেকে ভেবে দেখলে শেষমেশ ভাষার মধ্যে জয় কিন্তু আমজনতার মুখের ভাষারই হয়েছে— কী বলুন! চণ্ডালই চ্যাম্পিয়ান!'

ভোলানাথবাবু বললেন, 'তা হয়তো হয়েছে, কিন্তু এখনও চলিতকে চণ্ডাল বলতে আমরা যেভাবে খেপে উঠলাম, তাতে মনে হচ্ছে সামাজিক সাম্য-টাম্য আসতে এখনও ঢের দেরি।'

ছবি : শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

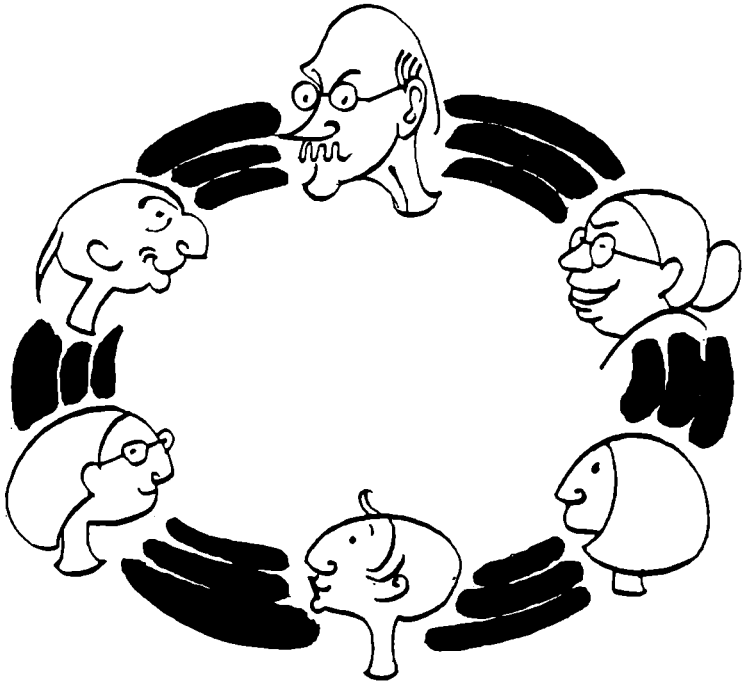

মৌতাত

শ্রীকর নন্দী

সময়ের স্বাদ আছে
টক্-ঝাল-মিষ্টি!
ঘাম-ছোটা গরমেতে
নামে যদি বিষ্টি—
আরামেতে নাচে মন!
বাড়ে খিদে চন-মন!!
জমে খুব খিচুড়ি ও
ইলিশের ফিষ্টি!!

খাতড়া যেতে

সোমনাথ চক্রবর্তী

আর পাহাড়ে চড়বো না ভাই,
সেই পাহাড়ে উঠছে রোদ ...
মশক পাহাড় ছন্নছাড়ার
হারিয়ে আসা সে সম্পদ।

পাহাড় ভরা গাছের মায়া
বাহারী ফুল, সবুজ ঝোপ;
বনঝিঁঝি গায় পাথর গুহায়
অন্ধডেরার পায়রা খোপ।

সেইখানে আজ মন যেতে চায়
খাতড়া যেতে পথের ধার;
জমছে নুড়ি সিঁড়ির ধাপে,
স্বপ্নালু চোখ ঘুম-পাহাড়।

পড়তি দিনের মেঘলা বেলায়
মশক পাহাড় স্বপ্ননীল ...
সেই সাথিরা ক্ষণিক আলোর
আকাশ পারের শঙ্খচিল।

আফ্রিকা-ভ্রমণ

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার

মিশর-লিবিয়া-চাদ
কেনিয়া,
যেতে চাই, যাবে ভাই
কে নিয়া?

কালাহারি-সাহারা বা
হারারে,
যাবো ভাই, যাবো ঠিক
দাঁড়ারে!

সুদান-সোমালি-ঘানা
জাইরে,
বড় সাধ, যেতে তাই
চাইরে!

জাম্বিয়া-মালি-আল্
জিরিয়া,
বলিস্ কি, আসবি না
ফিরিয়া?

অ্যাঙ্গোলা-আদ্দিস
আবাবা,
যার যেথা খুশি চলে
যা বাবা!

নামিবিয়া-ক্যামেরুন
কঙ্গো,
আই লাভ্ পশ্চিম
বঙ্গ!

বিলেতি ছড়া

মানসী বড়ুয়া

ছ' পয়সার গান ধর্ না
পকেট দানায় ঠাসা;
চব্বিশটা কালো পাখির
পিঠে রাঁধা খাসা।

পিঠে যখন কাটা হল
পাখিরা গায় গান;
এমন আজব খানা রাজা
কোথায় বা আর পান?

রাজা ব্যস্ত টাঁকশালেতে
গুনতে টাকা শুধু;
রানি ব্যস্ত পাকশালে তাঁর
খেতে রুটি মধু।

দাসী ব্যস্ত বাগানেতে
মেলতে কাপড়-জামা;
একটা কালো পাখি যে তার
ঠুকরালো নাকখানা।

Sing a song of sixpence,
A pocket full of rye;
Four and twenty blackbirds
Baked in a pie.

When the pie was opened
The birds began to sing;
Was not that a dainty dish
To set before the king?

The King was in his counting house
Counting out his money;
The queen was in the parlour
Eating bread and honey.

The maid was in the garden
Hanging out the clothes;
Down came a blackbird
And pecked off her nose.

এই ছড়াটি লেখা হয়েছিল ষোড়শ শতকে। এই ছড়া রচনার ইতিহাস নিয়ে নানা ধরনের গল্প প্রচলিত ছিল। এর মধ্যে একটি ছিল ইংল্যান্ডের রাজা অষ্টম হেনরী এবং তাঁর দুই রানি ক্যাথেরিন অফ অ্যারাগন আর অ্যান বোলেইনকে নিয়ে। কারো কারো ধারণা ছিল এই ছড়ার তিনটি পংক্তির তিনজন চরিত্র হলেন যথাক্রমে রাজা অষ্টম হেনরি, রানি ক্যাথেরিন আর অ্যান বোলেইন। তবে এই প্রচলিত ধারণার পেছনে প্রতিষ্ঠিত কোনো যুক্তি ছিল না। অন্যদিকে, ষোড়শ শতাব্দীর রান্নার বইয়ে জ্যান্ত পাখি দিয়ে পিঠে বা পাই রান্নার প্রণালী পাওয়া যায়। সে সময়কার কাহিনীতে এমন ঘটনারও উল্লেখ আছে যেখানে জ্যান্ত পাখি পিঠের ভেতরে পুরে তা রান্না করা হয়েছে। তারপর ভোজসভায় যখন অতিথিদের সামনে সেই পিঠে কাটা হয়েছে, তখন উড়ে বেরিয়ে এসে সেই পাখিগুলো ভোজসভায় সৃষ্টি করেছে অসাধারণ চমক। এ ধরনের ঘটনা অতিথিদের মুহূর্তের জন্য বিভ্রান্ত করেছে। ভোজসভায় আলোচনার মূল বিষয় হয়ে উঠেছে জ্যান্ত পাখি পুর দেওয়া পিঠে।

শিকারের গল্প

কুলদারঞ্জন রায়

"শিকারের গল্প"— কথাটা পড়লে তোমরা হয় ত ভাববে— সব বানান গল্প। কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। "গর্ডন কামিং" নামে খুব প্রসিদ্ধ একজন শিকারী, দক্ষিণ আফ্রিকার বনে শিকার করতে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি সিংহ, হাতী, গণ্ডার জলহস্তি, কুমীর, নেক্‌ড়ে বাঘ, মহিষ, হরিণ প্রভৃতি অনেক জন্তু শিকার করেছিলেন। শিকার করতে গিয়ে, মাঝে মাঝে তিনি এমন সাংঘাতিক বিপদে পড়েছিলেন, যে, সে সব কথা পড়তেও গায়ে কাঁটা দেয়। এই সমস্ত শিকারের কাহিনী দিয়ে কামিং সাহেব বই লিখেছেন— "Five years' adventures in the far interior of South Africa" —তোমরা বড় হয়ে এই বইখানা পড়ে দেখো। আজ তোমাদের কামিং সাহেবের হাতী শিকারের একটা গল্প বলছি—

কামিং সাহেব লিখেছেন ঃ— দক্ষিণ আফ্রিকায় গেলে পর, যখনই আমি বনের মধ্যে জলের কাছে তাঁবু ফেলতাম, তখনই আমি করতাম কি— জলের ধারে গভীর গর্ত্ত করে, তার মধ্যে বন্দুক নিয়ে বসে পাহারা দিতাম। রাত্রে সিংহ, হাতী প্রভৃতি জন্তু জল খেতে আস্‌ত, আমিও গর্ত্ত থেকে আমার পছন্দ মত কোন একটাকে শিকার করতাম। একদিন সকালে গর্ত্ত থেকে উঠে বন্দুক হাতে চল্‌লাম— রাত্রে যে একটা হাতীকে গুলি করেছিলাম, সেটার পথ ধরে, তাব পায়ের দাগ দেখে দেখে। খানিক দূরে গিয়ে দেখলাম, একটা মাটি-পাথরের ঢিপি। সেটার উপরে উঠলাম, চারদিক চেয়ে দেখব বলে। উঠে দেখলাম, দক্ষিণে প্রায় পোয়া মাইল দূরে, কয়েকটা হাতী নিশ্চিন্ত মনে চরে বেড়াচ্ছে।

সঙ্গে ছিল আমার চাকর আইজাক্, আর জনকয়েক কাফ্রী গাইড্ (যারা পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়)। ঢিপি থেকে নেমে আইজাককে তাঁবুতে পাঠিয়ে দিলাম— আমার হাতীমারা বন্দুক, কুকুরগুলো আর একটা ঘোড়া নিয়ে আসতে। আমার একজন কাফ্রী চাকর ছিল, সে সাহসী এবং ভাল শিকারী, তার নাম ছিল "ক্লিন্‌বয়"— তাকেও ডেকে আন্‌তে বল্‌লাম। আর বলে দিলাম, তাঁবুতে যেন কেউ গোলমাল না করে।

তারপর আবার ঢিপিতে চড়ে, দূরবীণ দিয়ে হাতীগুলোকে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম। সবগুলোই কুন্‌কী হাতী, তাদের সঙ্গে

কয়েকটা বাচ্চাও ছিল। দূরবীণ দিয়ে চারদিকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে, আরো এক দল হাতী দেখা গেল— উত্তর দিকে প্রায় এক মাইল দূরে, পাঁচটা দাঁতাল নর হাতী চরে বেড়াচ্ছে। ঢিপিটার নীচ থেকেই লম্বা একটা পাহাড়ের আলির মত চলেছিল, দেখ্‌লাম, কুন্‌কী হাতীগুলো চর্‌তে চর্‌তে সেই আলিটার দিকেই যাচ্ছে। আমি ত শিকার আরম্ভ করবার জন্য মহা ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। ভাব্‌লাম, ঘোড়ায় চড়ে, কুকুর সঙ্গে নিয়ে দাঁতালগুলোকে শিকার কর্‌তে হবে। এই স্থির করে, কাফ্রী গাইড্‌দের বল্‌লাম, ঢিপিতে উঠে হাতীগুলোর উপর নজর রাখতে। হাওয়া ছিল অনুকূল, ঝোঁপ ঝাঁপের আড়ালও ছিল যথেষ্ট— তারই সাহায্যে আমি কুন্‌কী হাতীগুলো থেকে প্রায় একশ গজ দূরে, পাহাড়ের আলির আশ্রয়ে পৌঁছালাম। হাতীগুলো খেতে খেতে আমার দিকে আস্‌ছিল। ক্রমে দুটো হাতী আমাকে পার হয়ে গেল। সবচেয়ে সুন্দর হাতীটা, যেটাকে আমি পছন্দ করছিলাম, সেটা তখন আর দুটো হাতীর সঙ্গে আমার থেকে প্রায় ৬০ গজ দূরে খাচ্ছিল।

একটা পাথরের উপর হাত রেখে, ভাল করে তাগ করে গুলি ছাড়লাম— হাতীটার মাথায়, চোখের একটু পিছনে। গুলি ঠিকই লাগল বটে, কিন্তু হাতীটা যেন গ্রাহ্যও কর্‌ল না। ভীষণ এক ডাক দিয়ে, হাতীটা ফিরে দাঁড়াল, আমিও আর এক গুলি বসিয়ে দিলাম— কাঁধের একটু পিছনে। তখন সবগুলি হাতীই ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট্‌ল। আমি গিয়ে আবার সেই ঢিপিতে উঠলাম। কাফ্রী গাইডগুলো আঙুল দিয়ে দেখাল— ঐ হাতীগুলো খানিক দূর গিয়ে গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়েছে— আহত হাতীটা খানিক পিছনে অন্য একটা হাতী, বোধ করি তার বন্ধু, সেটার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হয় যেন, এই হাতীগুলো এর আগে আর বন্দুকের আওয়াজ কখন শুনেনি। বাতাস অনুকূল থাকায় আমাদের গন্ধ পায়নি, আমাকেও দেখতে পায়নি— তাই হাতীগুলো একেবারে না পালিয়ে, খানিক দূর গিয়েই আবার দাঁড়িয়েছে।

ততক্ষণে আমার ঘোড়া, কুকুর, বন্দুক, চাকর সবই এসে উপস্থিত। তখন ঘোড়ায় চড়ে হাতীগুলোর দিকে চল্‌লাম। প্রায় দুইশ গজ গিয়ে খোলা জমি, সেখানে যেতেই হাতীগুলো আমাদের দেখ্‌তে পেল আর তখনই ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন। আহত হাতীটা পিছনে পড়াতে, আমার কুকুরগুলি গিয়ে তাকে ঘেরাও করে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল।

আমি করলাম কি— আহত হাতীটা আর পলাতক হাতীগুলোর মাঝখানে গিয়ে, ঘোড়া থেকে নামলাম— হাতীটা থেকে ৪০ গজ দূরে। আমার ঘোড়াটার নাম ছিল "কোলসবার্গ", সেটার উপরে ভর রেখে গুলি করব ভাবলাম। কিন্তু দারুণ ভয়ে কোলসবার্গ তখন অস্থির, আমার হাত নাড়িয়ে দেন— কিছুতেই গুলি করতে পারি না। অবশেষে কোনমতে তো গুলি করলাম, কিন্তু আর কি ঘোড়ার পিঠে চড়তে পারি? পিঠে চড়তে তো দিলই না, ভাবলাম, লাগাম ধরে টেনে নিয়ে ছুটে পালাব। কিন্তু যত সেটাকে টানি, ততই সেটা পিছিয়ে পিছিয়ে সেই আহত হাতীটার দিকে যেতে লাগল। এই সময়ে আমার পিছন দিকে আর একটা হাতীর আওয়াজ পেলাম। চেয়ে দেখি, সেই "বন্ধু" হাতীটা শুঁড় উঁচু করে গর্জ্জন করতে করতে, বিদ্যুদ্বেগে আমাকে তেড়ে আস্‌ছে। হাতীটার আগে আগে আমার একটা কুকুরও আসছে।

বুঝতে পারলাম, এবারে হয় আমার না হয় আমার ঘোড়ার দফা রফা! যা হোক, যা হবার তা হবে, কিন্তু ঘোড়াটা কিছুতেই ছাড়বে না— কোলস্‌বার্গের লাগাম মজবুত করে ধরে রইলাম। বলা বাহুল্য, আমার লোকজনেরা দূরে নিরাপদ স্থানে দাঁড়িয়ে ছিল— ভয়ে তাদের চোখ্‌ বড় হয়ে গিয়েছে, মুখ হাঁ হয়ে গিয়েছে! বাস্তবিক, তখন আমার যেমন তেমন বিপদের অবস্থা নয়! যাহোক্‌, সৌভাগ্যবশতঃ সে সময়ে কুকুরগুলো আমার সহায় হলো— তাই বেঁচে গেলাম। কুকুরগুলো হাতী দুটোকে ঘেরাও করে এমনি জ্বালাতন আরম্ভ করে দিল, যে, হাতী দুটো তখন আমার কথা ভুলে গিয়ে তাদের নিয়েই মহা ব্যস্ত। এই অবসরে হঠাৎ আমি ঘোড়ার পিঠে চড়ে একটু দূরে সরে পড়লাম। এমন সময় আমার চাকর ক্লিনবয় এবং আইজাক এগিয়ে এসে আমার হাতে হাতিয়ার বন্দুকটা দিল। আমিও আহত হাতীটাকে আর দুই গুলি মারলাম। কিন্তু কোলসবার্গ তখনও চঞ্চল— গুলি ঠিকমত লাগল না।

ততক্ষণে বন্ধু হাতীটিও আমার অনিষ্ট চিন্তায় ব্যস্ত হয়েছে। কাজেই, কি আর করা যায়, তাড়াতাড়ি বন্দুক আবার ভরে, তাকেও দুই গুলি! গুলি সাংঘাতিকই লাগল, কারণ, গুলি খেয়েই উঁচু শুঁড় নীচু করে তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট দিলেন। বন্ধুর পিছনে তাড়া করে গেলে, বোধ হয় তার দাঁত দুটিও পেতাম কিন্তু আহত হাতী নিয়েই তখন ব্যস্ত থাক্‌তে হলো। সেটাও বেশীক্ষণ নয়, আর দুই গুলির পরই তার জীবন লীলা সঙ্গে হয়ে গেল। ভারি সুন্দর হাতীটা ছিল, তার দাঁত দুটো ছিল কুনকী হাতীর দাঁতের পক্ষে খুবই বড়।

পুনর্মুদ্রণ : নবম বর্ষ 'সন্দেশ' থেকে

একটি ছবির গল্প

সর্বজিৎ সেন

যে পাহাড় চোখে দেখা যায় না

সুবীর দত্ত

আমরা সবাই জানি পৃথিবীর দীর্ঘতম পর্বতমালা হিমালয়, সবচেয়ে উচুঁ পর্বতশৃঙ্গ এভারেস্ট। কিন্তু এই পৃথিবীতেই রয়েছে আরও দীর্ঘ পর্বতমালা এবং অনেক উচুঁ উচুঁ পর্বতশৃঙ্গ। তবে আমাদের চোখের নাগালের বাইরে। রয়েছে এই পৃথিবীরই সমুদ্রের গভীরে। সেখানে গভীর গিরিখাতও আছে। এখানে দেওয়া হল সমুদ্রতলের সেই অবাক করা পাহাড়-পর্বত-গিরিখাতের নানান খবর। অর্থাৎ সমুদ্রের সব জল শুষে নিলে এবং তার অসংখ্য গাছপালা ও প্রাণীদের অন্যত্র সরিয়ে নিলে এক আশ্চর্য পৃথিবী আমাদের চোখের সামনে হাজির হবে।

পাহাড়-পর্বতের কথা বললেই আমাদের মনে আসে হিমালয়, আল্পস্, রকি, ইউরাল ইত্যাদির নাম। কিন্তু যদি বলি নাইনটি ইস্ট, কার্লসবার্গ, জুয়ান দ্য ফুকা, গালাপাগোস ইত্যাদি অর্থাৎ শৈলশিরার কথা? এগুলিও পাহাড়-পর্বত। তবে সমুদ্রের নীচে। মহাদেশের উপর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড়গুলির কথা যুগ যুগ ধরেই জানা— কিন্তু সমুদ্রের গভীরে সমুদ্রতলে বিস্তৃত পাহাড়, পর্বত, খাত— ইত্যাদি কথা বিজ্ঞানীরা মোটামুটি নিশ্চিতভাবে জানতে পেরেছেন মাত্র ৫০ বছর আগে। অতল সমুদ্রের রহস্যকে জানার উপযোগী আধুনিক উন্নতমানের যন্ত্রাদি আবিষ্কারের পর। বস্তুত এই পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্বতমালা রয়েছে সমুদ্রের গভীরে এবং তার ব্যাপ্তি ৭৫,০০০ কি.মি। বিশ্বের গভীরতম খাত (ট্রেঞ্চ) 'মারিয়ানা ট্রেঞ্চ' প্রশান্ত মহাসাগরের নীচে (১১,৫১৫ মি. গভীর)। পৃথিবীর সবথেকে উচুঁ পাহাড় এভারেস্টকে মারিয়ানা ট্রেঞ্চ-এ ঢুকিয়ে দিলেও তার চূড়া প্রায় তিন কিলোমিটার জলের নীচে থাকবে।

পৃথিবীর স্থলভাগের সমীক্ষা চলেছে দীর্ঘকাল ধরে, মহাদেশগুলির উপকূলের সমীক্ষার সূত্রপাত রেনেশাঁ যুগে, চলেছে গত তিনশ বছর ধরে। কিন্তু সমুদ্রের তলদেশের একটি গ্রহণযোগ্য মানচিত্র তৈরি করা সম্ভব হয়েছে মাত্র তিন দশকে (১৯৪৭ থেকে ১৯৭৭), ব্রুস সি. হিজেন এবং মারি থার্প-এর প্রচেষ্টায়। তথ্য জুগিয়েছে অসংখ্য গবেষণা-জাহাজ, সাবমারসিবল এবং বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি।

আজ যখন সমুদ্রবিজ্ঞানীদের কাছে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন আধুনিক প্রযুক্তি রয়েছে, পঞ্চাশ বছর আগের অবস্থাটা কল্পনা করা বেশ কঠিন। সে সময় শব্দতরঙ্গমাপক যন্ত্র 'ইকো সাউন্ডার' সবেমাত্র লাগাতার সমুদ্রের গভীরতা মাপা শুরু করেছে, তার সঙ্গে নমুনা সংগ্রহের কোরার এবং সমুদ্রের নীচে ছবি তোলার ক্যামেরা— এসব নিয়ে সমুদ্রতলের নক্সা তৈরির সূত্রপাত। অতঃপর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভূকম্পবিদ্যা, মহাকর্ষ বিদ্যা, চৌম্বক বিদ্যা এবং সমুদ্রতলের উষ্ণ স্রোত ইত্যাদির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ সমুদ্রতলের নক্সার মানকে আরো উন্নত করেছে। যুক্ত হয়েছে কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে সমুদ্রকে পরখ করা।

মহাদেশগুলির জমির উপরে যেমন হিমালয়, আল্পস বা রকির মতো উচুঁ পাহাড় রয়েছে, তেমনই সমুদ্রের জলের নীচেও অনেক বড় বড় পাহাড়ের হদিশ মিলেছে। যে আবিষ্কার গুরুত্বপূর্ণ, তা হল, সারা বিশ্বের সমুদ্রতলে এক পর্বতমালা রয়েছে— যার নাম 'মধ্য সামুদ্রিক শৈলশিরা'। এই দীর্ঘ বলয় যেন এক 'নূতন পৃথিবীকে ঘিরে রয়েছে। এই পর্বতমালা সম্পূর্ণভাবে আগ্নেয় শিলা— বাসল্ট দ্বারা তৈরি এবং তা পৃথিবীর ভেতর থেকে উঠেছে। এই পাহাড়গুলি মহাদেশের পাহাড়ের মত বলি-বিশিষ্ট নয়। সমুদ্রের গভীরে এই পর্বতমালার চূড়া বরাবর চলেছে একটি ফাটলের মতো উপত্যকা। বৈজ্ঞানিকদের মতে এই দীর্ঘ অথচ সরু উপত্যকা বরাবর 'নূতন সুমদ্রতল' তৈরি হচ্ছে। এই ফাটল বরাবর পাহাড়ের দুপাশ সরে যাচ্ছে এবং সমুদ্রতল প্রসারিত হচ্ছে। আধুনিক 'প্লেট টেকটনিক্স' তত্ত্ব এইসব তথ্য এবং ব্যাখ্যাকে জোরদার করছে।

উল্লিখিত 'মধ্য সামুদ্রিক শৈলশিরা' অতলান্ত এবং ভারত মহাসাগরের মাঝখান বরাবর অবস্থিত হলেও, প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্বসীমান্তে এর অবস্থান। সমুদ্রতলের খাত বা ট্রেঞ্চ, ৬০০০ মিটারের বেশি গভীর হয়। 'মারিয়ানা ট্রেঞ্চ'-এর কথা আগেই

আলোচিত হয়েছে। সামুদ্রিক টিলাগুলি সমুদ্রতল থেকে ১০০০ মিটারের বেশি উঁচু আগ্নেয়গিরি। এবং চূড়া সমুদ্রপৃষ্ঠ ভেদ করে উঁচুতে উঠলে আগ্নেয়গিরির দ্বীপ তৈরি হয়।

সমুদ্রতলের পর্বতশিরাগুলির নীচে রয়েছে গহ্বর, যার ভেতরে ১০০০° সে. তাপমানের 'ম্যাগমা' রয়েছে। এই উত্তপ্ত 'ম্যাগমা' সমুদ্রতলের দুই কি.মি. গভীর পর্যন্ত পৌঁছায়। প্রায় ১০ কোটি বছর আগে ক্রিটেশিয়াস যুগে যখন এই শৈলশিরাগুলি ফুলে ফেঁপে উঠে সমুদ্রকে অপসারিত করে, তখন সমুদ্রপৃষ্ঠ উঁচু হয় এবং মহাদেশের সমুদ্র সীমানা ধরে জল ঢুকে পড়ে। একে 'সামুদ্রিক অনুপ্রবেশ' বলা হয়।

আধুনিক সমুদ্রবিজ্ঞান সমীক্ষায় সমুদ্রতলে ধরা পড়েছে এক নূতন খনিজভাণ্ডার, যার সম্ভাবনা বিরাট। এগুলি পাওয়া গিয়েছে অতলান্ত এবং ভারত মহাসাগরের গভীরে মধ্য-সামুদ্রিক শৈলশিরায় এবং লোহিত সাগরের গভীরে।

শৈলশিরাগুলি নিরবিচ্ছিন্নভাবে সমুদ্রতলে বিস্তৃত নয়। মাঝে-মাঝেই চ্যুতি রেখা ('ফল্ট') শৈলশিরাকে তার পথ থেকে বিচ্যুত করেছে। দুটি 'ফল্ট' এর মধ্যবর্তী শৈলশিরা একটি সক্রিয় ড্রয়ার-এর মত। এখানে সমুদ্রতল প্রসারণের কেন্দ্র তৈরি হয়েছে। একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে মধ্যসামুদ্রিক শৈলশিরা, লোহিত সাগর এবং মেক্সিকো উপসাগরের সামুদ্রিক ফাটল এবং 'পূর্ব আফ্রিকা রিফ্‌ট'-এর মতন মহাদেশিয় ফাটল একই সমুদ্র প্রসারণের অংশ এবং একটি অপরটির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হয়ে পূর্ব-কথিত দীর্ঘ বলয়ের সৃষ্টি হয়েছে। চুম্বকীয় তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে, শৈলশিরাগুলির প্রসারণের মাত্রা বছরে প্রায় ১ সে.মি. (লোহিত সাগর) থেকে শুরু করে বছরে ২০ সে.মি. (পূর্ব আফ্রিকা স্ফীতি) পর্যন্ত হতে পারে।

আধুনিক সমুদ্রবিজ্ঞান সমীক্ষায় সমুদ্রতলে ধরা পড়েছে এক নূতন খনিজভাণ্ডার, যার সম্ভাবনা বিরাট। এগুলি পাওয়া গিয়েছে অতলান্ত এবং ভারত মহাসাগরের গভীরে মধ্য-সামুদ্রিক শৈলশিরায় এবং লোহিত সাগরের গভীরে। বিজ্ঞানীরা সারমারসিবল এবং বহু আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে 'গোডা' এবং 'জুয়ান দ্য ফুকা রিজ'-এ অনুসন্ধান চালাচ্ছেন এবং হিলিয়াম, মিথেন, ম্যাঙ্গানিজ, লোহা, সীসে, দস্তা এবং রূপোর পরিমাণের দিকে লক্ষ্য রাখছেন। 'ইস্ট প্যাসিফিক রাইজ' অঞ্চলের সুসংহত সমীক্ষা শুরু হয় ১৯৭৮ সালে 'এলভিন' এবং 'সায়ানা' সাবমারসিবল-এর সাহায্যে। শৈলশিরা থেকে নির্গত উত্তপ্ত কালো জল এবং কালো ধোঁয়ার পাশে আশ্চর্যজনকভাবে প্রাণের হদিশ পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরই সমুদ্রবিজ্ঞানের তথ্য সংগ্রহে জোয়ার আগে। এ-ব্যাপারে 'আটলান্টিস-এক' এবং 'ভেমা' গবেষণা জাহাজদুটির অবদান উল্লেখযোগ্য। সমুদ্রতলের অসমতল চেহারা অসংখ্য গিরিখাত এবং শৈলশিরার অবস্থিতি ধীরে ধীরে জানা যায়। এর বহু আগেই ১৮৭০ সালে ঐতিহাসিক 'চ্যালেঞ্জার' জাহাজের অভিযানে মধ্য 'অতলান্ত সমুদ্রের' গভীরে শব্দ তরঙ্গের মাধ্যমে একটি চওড়া উঁচু এলাকা ধরা পরে। ১৯২৫-২৭ সালে 'মেটিওর' জাহাজ এবং ১৯৪৭-৪৯ সালে 'এটলান্টিস-এক' জাহাজের অভিযানে সমুদ্রতলের শৈলশিরার চেহারা স্পষ্ট হয়। ওদিকে ১৯২০ সালেই 'ডানা' জাহাজের অভিযানে ভারত মহাসাগরের গভীরে 'কার্লসবার্গ শৈলশিরা' আবিষ্কৃত হয়। গত শতকের ষাটের দশক থেকেই ভারত মহাসাগরের গভীরে সমীক্ষা চালানো হয় এবং ধীরে ধীরে 'নাইনটি ইস্ট রিজ', সিন্ধু এবং, গঙ্গার মোহনা থেকে, সমুদ্রের গভীর পর্যন্ত পলনের কোণ বা 'ফ্যান' ধরা পরে। ১৯৫০ সালের পর থেকে বিভিন্ন এলাকার সমুদ্রের তলদেশের নকশা তৈরি শুরু হয়। এরপর ২০ বছর ধরে আরো তথ্য সংগ্রহ করে বিশাল আকারে 'ওয়ার্ল্ড প্যানোরামা' তৈরির কাজে হাত দেওয়া হয়। প্রথম প্রুফ আসার পর সমুদ্র বিজ্ঞানী হিজেন নিউক্লিয়ার সাবমেরিণ 'এন. আর- এক'-এ চেপে মধ্য অতলান্ত শৈলশিরার কয়েকটি অংশ ভালো করে পরখ করার উদ্দেশ্যে ১৯৭৭ সালের জুন মাসে রওনা হন। সেই অভিযানেই সমুদ্রতলের মানচিত্র সৃষ্টির জনক হিজেনের মৃত্যু হয়। এর কয়েকমাস পরেই হিজেন এবং থার্প-এর যুগান্তকারী প্যানোরামা প্রকাশিত হয়।

সমুদ্রতলের পাহাড়-পর্বত ইত্যাদির কথা এখানে আলোচিত হল। সমুদ্রের উদ্ভিদ এবং প্রাণীদের কথা অন্যত্র।

যমুনাবতী

রাজা রায়

আগে যা ঘটেছে

আট বছর বয়সী রূপু বেড়াল ভালোবাসে, কিন্তু বাড়িতে বেড়াল পোষা বারণ, কেন না আয়াদিদি বেড়াল দেখতে পারে না। একদিন বৃষ্টিতে ভেজা এক বেড়াল-বাচ্চাকে উদ্ধার করতে গিয়ে সে পড়ল এক ট্রাকের সামনে। দুর্ঘটনার পরেই রূপু দেখে কীভাবে যেন বেড়াল হয়ে গেছে সে! বেড়ালরূপী রূপুকে কেউ চিনতে পারেনি, তাড়িয়ে দিয়েছে আয়াদিদিও। ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত রূপু পথে পথে ঘুরে আশ্রয় নিয়েছিল একটা গ্যারেজে। সেখানেও একটা কান-ছেঁড়া হলদে হুলোর আক্রমণের শিকার হল। রাস্তায় ছিটকে পড়ে দু-চোখে অন্ধকার দেখল রূপু। বহুক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরে দেখল জেনি ওরফে যমুনাকে। তার নতুন বান্ধবী। তার কাছে রূপু যেমন আশ্রয় পেল, তেমনি বেড়াল-জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু পাঠও শিখে নিল। সেই শেখা চলল প্রায় দু'সপ্তাহ ধরে।

পাঁচ : যমুনার কথা

শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে রূপু অতিষ্ঠ করে দিচ্ছিল যমুনাকে। 'এবার তোমার কথা বলো। আমার গল্প তো পুরোটা শুনলে। এবার বলো, তুমি কোথা থেকে এলে এখানে।'

যমুনা হাসে, 'আমরা কোথা থেকে এলাম? সে অনেক লম্বা কাহিনি। জানো তো, বাঘ-সিংহের সঙ্গে আমরা একই পরিবারভুক্ত? এ পৃথিবীতে আমরা এসেছি মানুষের অনেক আগে। সম্ভবত আমাদের উদ্ভব আফ্রিকায়।' রূপু পা-তালি (বেড়ালদের তো হাত নেই, তাই তার পা দিয়ে তালি বাজায়) দিয়ে বলল, 'কী মজা! আমাদেরও তাই।' সে কদিন আগেই কাগজে পড়েছিল মানুষের উদ্ভব আফ্রিকায়— সেখান থেকেই তারা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে।

শুনে যমুনা তো অবাক, 'তাহলে মানুষে-মানুষে সাদা-কালোয় এত ভেদাভেদ, ঝগড়া-বিবাদ কেন? মানুষের ব্যাপার ভাই বোঝা ভার। যাহোক, আজ থেকে প্রায় হাজার দুয়েক বছর আগে আমরা কিছুটা পোষ মানি, যদিও আমাদের অনেক গোষ্ঠী আজও পোষ মানেনি। পোষ মানলেও আমরা কিন্তু কুকুরের মতন মানুষের পদানত হয়ে থাকি না— খানিকটা স্বাধীনতা আমাদের চাই। তোমাদের যীশুখৃষ্ট জন্মাবারও তিন হাজার বছর আগে মিশরে মানুষ আমাদের পুজো করত। ওই উত্তর আফ্রিকা থেকেই আমাদের একদল চলে যায় পশ্চিম ইউরোপে, আরেক দল মধ্যপ্রাচ্য— সেখান থেকে আমরা পড়ে ছড়িয়ে পড়ি এশিয়া ও আমেরিকায়।'

চোখ গোল গোল করে রূপু এ কাহিনি শুনছিল। এবার বলল, 'দারুণ ব্যাপার তো! আচ্ছা, শুধু ইউরোপ, এশিয়া, আমেরিকা, আফ্রিকা কেন, অস্ট্রেলিয়ার কথা তো বললে না?' যমুনা বলল, 'ওই মহাদেশটায় আমরা গিয়েছি সবার শেষে। তিন-চারশ বছর আগে সাহেবরা যখন জাহাজে চড়ে ওখানে যায়, তখন আমরাও ওই জাহাজেই পৌঁছাই ওখানে। শুধু ওখানেই নয়, মহাসাগরের বিভিন্ন দ্বীপে আমরা পৌঁছেছি জাহাজে আর সেখানে কলোনি গড়ে তুলেছি।'

রূপু তো অবাক! 'জাহাজে বেড়াল? বলো কী?'

'আরে, জাহাজে বেড়াল তো থাকবেই। জাহাজি বেড়ালদের কদরই আলাদা। জাহাজের খোলে বস্তায় ভরে চাল, গম, চিনি, ময়দা, আলু এসব যায় না? সেখানে ভয়ানক ইঁদুরের উপদ্রব। জাহাজি বেড়ালদের কাজই হল ইঁদুর মারা। আমরা ছাড়া মানুষ জাহাজে লম্বা পাড়ি দিত কেমন করে? ধনেপ্রাণে মারা পড়ত সবাই। তবে জাহাজি বেড়ালদের ইঁদুর খাওয়া বারণ। সারারাত ইঁদুর মেরে ওরা লাইন করে রাখে দেহগুলো। সকালে লস্করেরা দেখে ডেকে আনে মেট সাহেবকে। মেট সাহেব দেখে খুশি হলে গ্যালি থেকে খাবার আসে— দুধ, ডিম, টিনের মাছ, মাংস, আরো কত কী! জাহাজি বেড়ালদের কেতাই আলাদা।'

রূপু জিগ্‌গেস করল, 'তুমি কখনও জাহাজে চড়েছ?' যমুনা বলল, 'না ভাই।' বলেই কেমন উদাস ভাবে ফোঁশ করে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে থাবা চাটতে লাগল। তারপর বলল, 'আমার খুব ইচ্ছা মায়ের দেশ দেখার। আমার মায়ের আত্মীয়স্বজন এখনও সেখানে আছে। সে দেশের নাম দার্জিলিং।'

রূপু একবার মা-বাবার সঙ্গে দার্জিলিং বেড়াতে গিয়েছিল। এবার সে সোৎসাহে বলল, 'দারুণ জায়গা দার্জিলিং। একবার ট্রেনে চেপে পড়লেই হয়।' যমুনার চোখ দুটো চকচক করে উঠল।

এবার রূপু বলল, 'তোমার এমন সুন্দর বড় বড় লোম। তুমি কি কাবলি বেড়াল?'

হেসে ফেলল যমুনা, 'ব্যাপারটা এত সহজ নয়। আগেই বলেছি আদিতে আমরা এসেছি আফ্রিকা থেকে। সেখান

থেকে আমাদের পূর্বস্ত্রীরা আসে মধ্যপ্রাচ্যে। সেখানে তারা দুই গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে যায়। একদলকে বলে আংগোরা আর অন্যদলকে বলে পার্সিয়ান। তোমরা কাবলি বেড়াল বললেও সাহেবরা এই দুই নামেই চেনে আমাদের।'

'আচ্ছা, কত রকমের বেড়াল আছে?' রূপুর পরবর্তী প্রশ্ন।

'ওঃ, তার কী শেষ আছে? আমাদের যেসব জ্ঞাতি পোষ মানেনি, তাদের প্রজাতি আছে প্রায় চল্লিশটা।

রূপু উৎসাহের সঙ্গে বলল, 'হ্যাঁ, জানি। বাঘ, সিংহ ছাড়াও আছে চিতাবাঘ, জাগুয়ার, পুমা, অসেলট, তুষারচিতা। আরো কী কী যেন!' বাবার কাছে জন্তু জানোয়ারের গল্প শুনতে রূপু ভালোইবাসত।

খুশি হয়ে যমুনা বলল, 'বাঃ, অনেক জান তো তুমি। তবে এসব ছাড়াও প্রায় অজানা অনেক রকমের বনবেড়াল আছে— আমেরিকার জাগুয়ারুন্ডি, টায়রা, মারগে; আফ্রিকার চাউস বা সার্ভাল; এশিয়ার মেছো বেড়াল, বাঘরোল ইত্যাদি। এখনো মানুষ আমাদের সব জাতভাইদের চেনে না। আমি নিশ্চিত যে আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ঘন জঙ্গলে আমাদের সঙ্গীসাথি আছে, যাদের হদিশ মানুষ পায়নি। আর যে-হারে জঙ্গল কাটা হচ্ছে তাতে মানুষ জানবার আগেই এরা হয়তো হারিয়ে যাবে।'

রূপুও বলল, 'সত্যি। মানুষ যেভাবে চলছে তাতে বনজঙ্গল আর অনেক বন্যপ্রাণীই হারিয়ে যাবে কয়েক বছরের মধ্যে।' যমুনা প্রশংসার সুরে বলল, 'তোমার মতন এমনভাবে যদি সব মানুষ ভাবত, তবে দুনিয়াটা হত অন্যরকমের। তবে আমরা যারা কিছুটা পোষ মেনেছি তারাও নানারকম জাতে পালটে গেছি। তাদের মধ্যে পার্থক্যও কম নয়। অবশ্য মানুষে-মানুষে তফাৎই বা কী কম?'

রূপু বলল, 'পোষা বেড়ালেরও জাতের সংখ্যা তো কম নয়।'

যমুনা বলল, 'হ্যাঁ, মানুষ যাদের পোষ মানিয়েছে তাদেরও কাছে অগুনতি জাত বা ব্রীড। শুদ্ধ ব্রীডের আবার কদর কত! আমাদের এই আংগোরা বা পার্সিয়ান ছাড়াও এশিয়াতে আছে সায়ামিজ, জাপানি, বালিনিজ, টংকিন এবং ভারতের মধ্যে বাংলা বা বোম্বাইয়ের বেড়াল। আফ্রিকায় আছে মিশরীয়, লিবিয়ান বা কাফির। আবার আমেরিকায় আছে র‍্যাগডল, ববটেল, কার্ল, আরো কত কী! আর ইউরোপে তো অগুন্তি ব্রীড— লং হেয়ার, শর্ট হেয়ার, টর্টয়েজ শেল, মাল্টিজ, ম্যাংক্স ইত্যাদি। ওই ম্যাংক্স বেড়ালরা এসেছে আইল অফ ম্যান দ্বীপ থেকে। ওদের মোটে ল্যাজ নেই, তাই আমরা ওদের ভালো চোখে দেখি না। যাক্ গে, আমরা মূলত আংগোরা গোষ্ঠীর, তবে কালক্রমে কিছুটা মিশ্রিত হয়ে গেছি। শুনেছি তুরস্কের রাজধানী আংকারা থেকেই আংগোরা কথাটা এসেছে।'

রূপু পা-তালি দিয়ে বলল, 'কী মজা! তুমি তুর্কি বেড়াল আর ওই তুর্কি দেশ থেকেই সৈন্যসামন্ত নিয়ে গোটা উত্তর ভারত জয় করে নেয় মুসলমানরা। আমাদের রক্তেও বোধহয় তুর্কি রক্তের মিশেল আছে। আচ্ছা, তখন তুমি পূর্বস্ত্রী বললে কেন? আমরা তো বলি পূর্বপুরুষ।'

যমুনা বলল, 'সবকথা তুমি এখন বুঝবে না। তোমাদের হল পুরুষ-শাসিত সমাজ আর আমাদের মাতৃতান্ত্রিক সমাজ। আমাদের সমাজে মায়েরাই বড়ো। আর হবে না-ই বা কেন? মায়েরা আমাদের দুধ খাওয়ায়, রক্ষা করে, বেড়ালত্বের সব শিক্ষাই আমরা পাই মায়ের কাছ থেকে। বাবার সঙ্গে আমাদের কতটুকু সম্পর্ক? আবার অনেক হুলোবেড়াল আছে যারা বেড়ালবাচ্চা দেখলেই খেয়ে ফেলে। ওদের থেকে দূরে থাকাই ভালো নয় কি?'

রূপু বলল, 'আমার বাবাও অবশ্য দূরে দূরেই থাকেন। কিন্তু এরকম নয় তো। কলকাতায় এলেই আমাকে বেড়াতে নিয়ে যান, আইসক্রিম খাওয়ান। সত্যি, বেড়াল আর মানুষদের নিয়মকানুন এক্কেবারে আলাদা। আচ্ছা, তোমার মা-র কথা বললে না তো?'

যমুনা বললে, 'দেখেছ তো, আমাদের চালচলন একটু সাহেবি। হবে নাই বা কেন? আমরা চৌদ্দপুরুষ ছিলাম ওই সাহেবদের পোষা। মা-র কাছে শুনেছি মা-র দিদিমার দিদিমার দিদিমাকে রবার্টসন সাহেব নিয়ে যান দার্জিলিং। রবার্টসন সাহেব মস্ত সাহেব ছিলেন। ওঁর নামে দার্জিলিঙে একটা রাস্তাও আছে। বার্চহিল রোডে ওঁর বিরাট বাংলোতে আমাদের ওই পূর্বমহিলা থাকতেন আর শীতের দিনে ফায়ার প্লেসের সামনে আগুন পোয়াতেন। বংশ-পরম্পরায় আমরা ওই বাংলোতেই ছিলাম, খেতাম দুধ, ডিম, চিজ, ক্রিম, সসেজ, বেকন এইসব। আমাদের ভাগ্য পরিবর্তন ঘটল আমার দিদিমার মা-র সময়ে। দেশ নাকি তখন স্বাধীন হল আর রবার্টসন সাহেবের পরিবারও চাটিবাটি গুটিয়ে বিলেত পাড়ি দিল। উনি তাঁর প্রিয় বেড়ালকে ছেড়ে যেতে চাননি কিন্তু বুড়ো বয়সে দেশ ছাড়ার ইচ্ছা ছিল না আমার প্রমাতামহীর। শেষ অবধি তিনি চলে যান ব্যানকবার্ন চা-বাগানের ম্যানেজার স্মিথ সাহেবের বাংলোতে। তিনি ছিলেন রবার্টসন সাহেবের বন্ধু। আমার দিদিমার ছোটোবেলাটা কেটেছে সেই চা-বাগানে।

কিন্তু আমার দিদিমাকে ওই স্মিথ সাহেবের এক বন্ধু নিয়ে আসেন কলকাতায়। দিদিমা মহা আদরে সাহেব বাড়িতে ছিলেন— তোমাদের ওই পার্ক স্ট্রিটের উপর কুইন্স ম্যানসনে। তখন অবশ্য ও বাড়িটার নাম ছিল গলস্টন ম্যানসন আর তার চেহারাও ছিল ঝকঝকে। জান তো, গলস্টন সাহেব ছিলেন আর্মেনিয়ান আর কলকাতার মধ্যে সব চেয়ে বড়লোক। কত ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া ছিল তাঁর। কলকাতায় আর্মেনিয়ানরা এসেছিল ব্রিটিশ সাহেবদেরও আগে। কিন্তু এই শহরের অবস্থাও যেমন খারাপ হয়েছে, আর্মেনিয়ানদেরও তেমনই — গলস্টন সাহেব তো প্রায় কপর্দকশূন্য অবস্থায় মারা যান।'

এসব কথা রূপু শুনছিল মন্ত্রমুগ্ধের মতন। এবার বলল, 'কই, আমাদের হিস্ট্রি বইতে তো এইসব কথা লেখা নেই।'

যমুনা বলল, 'আরে, কী বা আছে তোমাদের ওইসব বইতে? জেনে রেখো কলকাতায় আর্মেনিয়ানদের গির্জায় সুকিয়াস বিবির কবর আছে আর তা তোমাদের জোব চার্ণকের কবরের থেকেও ঢের পুরোনো। যা হোক, মা বলতেন, ওই গলস্টন সাহেবের বাড়িতে ওঁরা ফ্লুরিজের পেস্ট্রি বা লেমন টার্ট ছাড়া খেতেন না। তাও দিদিমার পছন্দ হত না, তাঁর মুখে লেগে ছিল প্লিভা আর পেলিটির স্বাদ। মা অবশ্য পার্ক স্ট্রিট থেকে পরে চলে যান শর্ট স্ট্রিটে স্টিফেন সাহেবের বাড়ি। সেখানেই আমাদের চার ভাইবোনের জন্ম। তখন অবশ্য আমাদের অবস্থা একটু পড়ে

এসেছে। তারপর— তারপর আমি চলে যাই ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে।' এই অবধি বলে যমুনা থামল আর সামনের থাবা দুটো চাটতে লাগল বারবার।

'থামলে কেন যমুনা, বলো।' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রূপু 'কে থাকত ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে?' একটু থেকে যমুনা বলল, 'ডিসুজা নামে একটি পরিবার। বাবা, মা আর এক মেয়ে— নাম তার ইভন। কী ভালোই না বাসত আমাকে। অন্তত, আমি তা-ই ভাবতাম। ইভনই আমার নাম দেয় জেনি, জেনি ডিসুজা। তার আগে ছোটোবেলায় আমাকে স্টিফেন সাহেব ডাকতেন জিন বলে। অবস্থা ওদের খুব একটা ভালো ছিল না, কিন্তু চলে যেত মোটামুটি। সকালে ব্রেকফাস্ট করে আমাকে আদর করে ইভন চলে যেত লোরেটো স্কুলে। ফিরত দুপুরে। ফেরার আগেই আমি দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতাম আর ফিরেই সে ছুট্টে এসে আমায় কোলে নিত। আনন্দে চোখ বুজে আমি গরগর করতাম। ও আমাকে কখনও রাখত কোলে আর কখনও বা গলায় জড়িয়ে। আমাকে পাউডার মাখাত, সেন্ট দিত, নতুন রিবন জড়িয়ে দিত। আমি ভাবতাম এক ভালো আমাকে কেউ বাসেনি। কী বোকাই যে ছিলাম!

হঠাৎ একদিন দেখলাম বাড়িতে মিস্ত্রি লেগেছে। বাক্স-প্যাঁটরা বাঁধা হচ্ছে, চেয়ার-টেবিল চটে জড়িয়ে রাখা হচ্ছে। ক্রমে বুঝলাম ওরা বাড়ি বদল করবে। কিন্তু আমাকে কেউ কিছু বলছে না। আমার মনে ভয়ানক দুশ্চিন্তা— ওরা আমাকে নিয়ে যাবে তো?'

'কী বলছো, যমুনা? তোমাকে এত ভালোবাসত ইভন, ফেলে যাবে কেমন করে?'

'তাই তো হল, রূপু। সব বাঁধাছাঁদা শেষ করে খাট-বিছানা যখন বাঁধা হল, ওরা তখন এক আত্মীয়ের বাড়িতে থাকত। আমার জন্য অবশ্য বাটিতে জল, থালায় দুধ, রুটি আর মাছ রেখে যেত। পরের দিন এসে আবার খাবার দিত আর জল পালটে দিত। দুদিন এরকম গেল। তারপর... তারপর আর ওরা এলই না।' যমুনা আবার থাবা চাটছে।

'সে কী কথা? কী অন্যায়! ওদের ফাঁসি দেওয়া উচিত,' চেঁচিয়ে বলল রূপু।

যমুনা ম্লান হেসে বলল, 'হ্যাঁ, সেই থেকে ওদের আর দেখিনি। দিন তিনেক চুপচাপ পড়েছিলাম। তারপর কয়েকটা অচেনা লোক এসে জিনিসপত্র টানাটানি করতে লাগল। বুঝলাম ওরা কুলি। ফ্ল্যাটটা দেখতেও কয়েকটি পরিবার এলেন। কিন্তু ডিসুজারা একেবারে ভ্যানিশ! পায়ে পায়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। একবার শর্ট স্ট্রিটে গেলাম। পাড়ার বেড়ালদের কাছে শুনলাম আমার মা মারা গেছেন গত বছর। ভাইবোনরাও ছড়িয়ে গেছে কোথায় কে জানে!...

সেই থেকে আমি রাস্তায়। কত আদরে থাকার পর রাস্তার জীবনে অভ্যস্ত হওয়া কীরকম শক্ত বুঝতেই পার। তবু তাই অভ্যাস করলাম। আর প্রতিজ্ঞা করলাম, আর কখনও মানুষের মায়ার বাঁধনে ধরা পড়ব না। সেভাবেই চলেছি। গত বছরখানেক আছি এই গুদামে। এর মধ্যে তুমি এসে পড়লে। বাস্, এই আমার গল্প শেষ।'

যমুনা থামল বটে, তার চোখ দুটি ছলছল করছিল। রূপুও কোনো কথা না বলে যমুনাকে চেটে দিল একমনে। যমুনাও শান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল।

ছয় : নতুন বন্ধু

যমুনার গল্প শুনে চাটাচাটি শেষ করে ওরা দুজনেই কুণ্ডলি পাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ একটা শব্দ শুনে ঘুম ভাঙল। তাকিয়ে দেখে গুদামের দরজাটা খুলে গোটা চারেক লোক ঘরে ঢুকেছে। তক্ষুনি ওরা ঘরের কোনায় অন্ধকারে সেঁধিয়ে গেল। কেউ ওদের দেখতে পায়নি।

লোকগুলো প্রথমে একটা সোফা-সেট বার করল। তারপর দুটো টেবিল, গোটা আষ্টেক চেয়ার, একটা বেলজিয়াম গ্লাসের আয়না সমেত ড্রেসিং টেবিল, ডেস্ক, কয়েকটা গ্রান্ডফাদার ক্লক আর পরী-টরি কিসব অ্যান্টিক মূর্তি সরাল। শেষে হাত দিল ওদের খাটটায়।

'সর্বনাশ', চাপা গলায় বলল যমুনা, 'এখানকার পাট গুটোতে হবে এবার।'

'কেন?' জিজ্ঞাসা করে রূপু, 'ওরা তো দেখতেই পায়নি আমাদের।'

যমুনা বুঝিয়ে বলল, 'আরে, ওরা তো কুলি। ওদের নজরে কিছুই পড়ে না। ওরা এসব মাল নিয়ে যাচ্ছে পাশেই রাসেল এক্সচেঞ্জে। ওখানে কাল নিলাম হবে। তার আগে নিলামওয়ালারা সব ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করবে। তখনই

ওরা ওই খাটে আমাদের লোম-টোম পাবেই আর তখনই লোক পাঠাবে আমাদের তাড়াতে। কেউ ভাববেও না আমরা না থাকলে ইঁদুরে কেটে সব নষ্ট করত। আর অপেক্ষা করা যাবে না। চল এই বেলা পালাই।'

যে কথা সেই কাজ। লোকগুলো বিরাট খাটটা দরজা দিয়ে বার করতেই পাশ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল রূপু আর যমুনা। আর দে দৌড়, দে দৌড়!

কিন্তু যাবে কোথায়? প্রথমে রাসেল স্ট্রিট ধরে পার্ক স্ট্রিট, তারপর খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে রাস্তা পেরোনো। সন্ধ্যার মুখে ফ্রি স্কুল স্ট্রিট ধরে উত্তরে চলা। এদিকটা একটু অন্ধকার, কুকুরের উৎপাতও কম। খানিকটা এগিয়ে সারিসারি পুরোনো বইয়ের দোকান। তার মধ্যে একটা দোকানের একজন ফেজ টুপি করা বৃদ্ধ মুসলমান ভদ্রলোক একটা থালায় দুধ ঢেলে দিলেন ওদের জন্য। আশ্চর্য ব্যাপার তো! কিন্তু আরও আশ্চর্য ব্যাপার অপেক্ষা করছিল রূপুর জন্য। এরকম ভাবে ও দুধ খায়নি তো কখনও — তাড়াতাড়ি খেতে গিয়ে নাকে-মুখে দুধ ঢুকে গিয়ে বিষম খেয়ে হেঁচে-কেশে সে এক কাণ্ড! ভদ্রলোক তো হেসেই অস্থির— 'আরে, টেবল ম্যানার্স শেখো।' রূপু অপ্রস্তুত। তখন যমুনা বলল, 'জিভটা নীচের দিকে গোল করে নিয়ে দুধটা মুখের মধ্যে টেনে নাও।'

এরকম করে আবার দুধ খাওয়া যায় নাকি? কিন্তু চেষ্টা করে রূপু দেখল বেশ সহজেই খাওয়া যাচ্ছে। আধ প্লেট দুধ চোঁ-চোঁ করে মেরে দিয়ে সরে এল রূপু। আর ভুল করবে না সে, এবার তার বন্ধু যমুনার পালা। দুজনে খাওয়া শেষ করে মিঁয়া সাহেবকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে, তখন উনি বললেন, 'এখানেই থেকে যাও না। ইঁদুরের যা উৎপাত!' যমুনার আপত্তি বুঝে রূপুও রওনা দিল।

এবার তারা লিন্ডসে স্ট্রিট ধরে নিউমার্কেটের সামনে এল। পুরোনো নিউমার্কেট রূপুর বেশ চেনা— মায়ের সঙ্গে মাঝে মধ্যেই আসত আর নাহুম-এর প্যাটিজ, চিজ স্ট্র খেত। সামনে কয়েকটা নেড়ি কুকুর বসে ছিল কিন্তু ওদের ঘাঁটায়নি। নিউমার্কেটের পাশের গলি থেকে এক বুড়ো বেড়াল ওদের দেখেই হাঁক পাড়ল 'অ্যাও! কে যায়?' ভদ্র ভাবে পরিচয় দিয়ে ওরা এগোল। কিন্তু চৌরঙ্গির সামনে এসে ওদের চক্ষু স্থির। এত গাড়ি! রাস্তা পার হবে কেমন করে? পুরোনো টাইগার সিনেমার পাশের গলিতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করল ওরা।

রাত বাড়ল, রাস্তা ফাঁকা হয়ে এল। এক দৌড়ে চৌরঙ্গি পার হয়ে গড়ের মাঠে ঢুকল ওরা। বেশ রাত তখন। গড়ের মাঠ প্রায় নিঝ্‌ঝুম। রূপুর গা ছমছম করছিল। আকাশে চাঁদ তখনও ওঠেনি, কিন্তু অবাক হয়ে রূপু দেখল যে ওর দেখতে খুব একটা অসুবিধা হচ্ছে না। অন্ধকারেও যমুনার চোখ জ্বলজ্বল করছে। যমুনা বলল, 'হবেই তো। আঁধারের শিকারী প্রাণী আমরা। অন্ধকারে আমাদের অসুবিধা হবে কেন?'

বেশ ক্লান্ত লাগছিল। একটা গাছের কাছে এসে যমুনা বলল, 'এই গাছেই বিশ্রাম করা যাক। ভোর না হতেই আবার শুরু হয়ে যাবে কুকুরের উপদ্রব।' কিন্তু রূপু তো আদুরে কলকাতার ছেলে। গাছে কখনও চড়েইনি সে। যমুনার নির্দেশে ফ্লাইং জাম্প দিয়ে দিব্যি গাছের বাকলে নোখ বসিয়ে পায়ে পায়ে উঠে গেল। তারপর যেখানে দুটো ডাল বেরিয়েছে দুদিকে সেখানটায় আরাম করে ল্যাজ ঝুলিয়ে শুল রূপু। আর তার পাশেই যমুনা।

কয়েক ঘণ্টা ঘুমোবার পরেই যমুনা ডাকল রূপুকে। তখন খুব ভোর। তারারা তখনও ডোবেনি। পুব আকাশটা সবে গোলাপী হয়ে এসেছে। এত ভোরে রূপু কখ্‌খনো ওঠে না। কিন্তু বেড়াল হয়ে অবধি ওর ঘুম বেশ কমে গেছে। ঘুম ভেঙে উঠে গা-হাত-পা চেটে পরিষ্কার করার পালা। তারপর মাঠে যখন নামল তখন সূয্যি ঠাকুর উঁকি দিচ্ছেন।

এই ভোরে গড়ের মাঠের চেহারা দেখে রূপু তো অবাক। দলে দলে মানুষ হাফ প্যান্ট, টি-শার্ট, কেড্‌স পরে হাঁটছে। কয়েকজন দস্তুর মতন ছুটছে। একদল চলেছেন গঙ্গার ঘাটের দিকে স্নান করতে, আবার আরেক দল ইতিমধ্যেই স্নান সেরে ফিরছেন। বড়ো বড়ো কেটলি হাতে 'চায় গরম' হাঁকছে চা-ওয়ালারা, সঙ্গে বয়ামে গোল বাঁদর বিস্কুট। দেখেই খিদে পেয়ে গেল রূপুর।

কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গোল বেঁধে গেল। ময়দানে সকাল থেকেই স্বাস্থ্যোদ্ধারকারীদের মতনই কুকুর-হাঁটনবাজদের ভিড়। এতক্ষণ বেশ কটা চেনে বাঁধা কুকুরকে প্রাতঃভ্রমণে যেতে দেখছিল রূপু আর যমুনা। তাদের দলে ডাশহুন্ড, টেরিয়ার, ককার স্প্যানিয়েল, অ্যালসেশিয়ান থেকে ডিয়ার-হাউন্ড পর্যন্ত সব জাতের এবং সব আকারের কুকুরই ছিল। তাদের কেউ কেউ রূপু-যমুনাকে অবজ্ঞার চোখে দেখলেও অনেকেই তাদের দেখে উত্তেজিত হয়ে চেঁচামেচি করছিল, কিন্তু চেনের বাঁধন ছাড়াতে পারেনি। রূপু তাদের কাণ্ড দেখে ছড়া কেটে বলল,

"মিছে দেখাস বাহাদুরি, ঘৌ ঘৌ ঘৌ করে
চেনে বাঁধা আছিস তোরা, বুঝিস নাকি ওরে?"

শুনে যমুনাতো বেজায় খুশি। আর ঠিক তখনই চেনের বাঁধন-মুক্ত একটা অ্যালসেশিয়ান ওদের তাড়া করল। এ কুকুরটার বয়স কম, বেশ তেজি আর জোরে দৌড়োতেও পারে। কাছাকাছির মধ্যে একটা গাছ না থাকলে রূপু-যমুনা বেশ বিপদেই পড়ত। এবার দুই লাফে গাছে চড়তে রূপুর কোনো অসুবিধাই হয়নি। কুকুরের নাগালের বাইরে দুই বন্ধু গাছের ডালে বসল ল্যাজ ঝুলিয়ে। চিৎকার চেঁচামেচি, লম্ফ-ঝম্প করে অ্যালসেশিয়ান মশাইয়ের অবস্থা বেশ কাহিল। রূপু আবার ছড়া কাটল,

"মিথ্যা লম্ফ-ঝম্প করে লাভটা কিরে বাবু?
কাজের বেলা অষ্টরম্ভা, নিজেই এখন কাবু।"

অ্যালসেশিয়ানের মালিক বহু কষ্টে তাকে টেনে নিয়ে গেলে ওরা আবার গাছ থেকে নেমে মাঠ পেরিয়ে চলল স্ট্র্যান্ড রোডের দিকে। স্ট্র্যান্ড রোডে গঙ্গার ধারে যেখানে সারি সারি গুদাম, সেখানে যমুনা দাঁড়াল একটু— তারপর সরু গলায় ডাক ছাড়ল 'মিঁয়াও'। ওমনি একটা ঘরের দরজা খুলে যে লোকটি বেরিয়ে এল সে বোধহয় ওই গুদামের দারোয়ান। বয়স পঁয়ষট্টি হবে, মুখে বয়সের ছাপ পড়লেও বেশ শান্ত একটা ভাব, মাথায় টিকি, গলায় পৈতে, পরনে একটা গামছা — দেখলেই বোঝা যায় এক্ষুণি সে গঙ্গাস্নান সেরে ফিরেছে। বেশ বোঝা গেল যমুনাকে সে বিলক্ষণ চেনে।

সে ওদের দেখেই বলল, 'আরে, পুষিমণি যে! কোথায় ছিলে এদ্দিন? আবার তোমার সঙ্গে বয়ফ্রেন্ড দেখছি যে। এসো, এসো। বেশ রোগা হয়ে গেছ দেখছি। খাবার-দাবার কি মতন জুটছে না বুঝি? তোমাকে তো কতবার বলেছি, এখানে থাকো। বুড়ো শিউপূজন গরীব হতে পারে, তার যা আছে বন্ধুদের সঙ্গে ভাগ করেই খাবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমরা দুজনেই এসো। বন্ধুদের জন্য আমার দরজা সবসময় খোলা।'

সহজ, সরল মানুষটিকে বেশ লাগল রূপুর। একটা আশ্রয় পাওয়া যাবে জেনে মনে মনে সে একটু নিশ্চিন্ত হল। একবার তাকাল যমুনার দিকে। যমুনা কিন্তু চাপা গলায় বলল, 'ঘরের মধ্যে আর বন্দি থাকব না। দাঁড়াও, একটু দুধ জোগাড় করি।' বলেই করুণ কণ্ঠে আবার 'মিঁয়াও' বলে ডাক দিল।

শিউপূজন এবার ব্যস্ত হয়ে উঠল। 'খুব খিদে পেয়েছে বুঝি? দাঁড়াও, দেখি কি আছে' বলেই ঘরে ঢুকল।

রূপু বলল, 'মানুষটা বেশ ভাল তো।'

যমুনা বলল, 'গোড়ায় গোড়ায় ওরকম মনে হয়। আশাকরি দুধটা বাইরে দেবে। ঘরে ঢুকতে আমি আর চাইছি না।' শিউপূজন কিন্তু ঘরের মধ্যেই একটা তোবড়ানো এনামেলের থালায় দুধ ঢালল। তারপর দুটো রুটি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে দুধে ডোবাল। তারপর ওদের ডাকল, 'এসো বন্ধুরা। যাহোক দুটো খেয়ে পেটটাকে একটু শান্ত কর। রান্না হয়নি তো এখনও। রান্না হলে আবার খাবার দেব।'

অগত্যা ওদের ঢুকতেই হল ঘরটায়। আর ঢুকতেই সে দরজাটা টেনে দিল। এবার ওরা বন্দি। ভাঙা টিনের ছাদ, ছোট্ট ঘর, কিন্তু বেশ পরিপাটি। একপাশে একটা খাটিয়া, তার উপরে চাদর-বালিশ টানটান করে পেতে রাখা, মানে রূপুর বিছানার মতন নয়। খাটিয়ার নিচে একটা পুরোনো তোরঙ্গ আর একটা পুঁটলি। দেওয়ালে দু-একটা হাঁড়ি-কড়া, হাতা-চামচ ঝুলছে। এক কোনায় একটা উনুন, তাতে বোধহয় ভাতের হাঁড়ি চড়ান। সামনের থলেতে কিছু সব্জি রাখা আছে। খাটের উল্টো দিকে একটা চৌকিতে ঠাকুরের ছবি, কিছু ফুল, বোধহয় পুজো করছিল। তার সামনেই একটা মোটা রামায়ণ রাখা।

দুই বন্ধুতে প্রায় নিঃশব্দে থালাটা শেষ করে দিল।

শিউপূজন খুব খুশি, বলল, 'খাটে উঠে বিশ্রাম কর না। আমি কাজকর্মগুলো সেরে নিই।' বলে ওদের গায়ে একটু হাত বুলিয়ে দিল। তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'আজ পুজোয় একটু দেরি হয়ে গেল। কি করব? আগে জীব, পরে শিব।'

ওরা দুই বন্ধু বিশ্রাম করছে। শিউপূজন দ্রুত পুজো সেরে ফেলল। তারপর চটপট ডাল আর সব্জি রান্না করল। পরে নিল একটা ধুতি আর ফতুয়া। নিজের খাবার বেড়ে নিল যেমন, ওদেরও আবার দিল ওই থালাটায়। ভাত, ডাল আর ট্যাঁড়শের তরকারি। কিন্তু তাই যেন অমৃত মনে হল রূপুর কাছে। ওদের জল দিল, তারপর ডিউটিতে বেরিয়ে গেল শিউপূজন। দরজাটা এত তাড়াতাড়ি টেনে দিল যে ওরা বেরোবার কথা ভাবতেও পারল না।

ঘরটায় জানলা নেই। অনেক উঁচুতে একটা ঘুলঘুলি। তার নাগাল পাওয়া প্রায় অসম্ভব। অবশ্য রূপুর বাবা বলেন, অসম্ভব বলে কিছু নেই। নেপোলিয়ন বলেছিলেন অসম্ভব কথাটা কেবল মূর্খদের অভিধানে পাওয়া যায়। রূপু যমুনাকে তাই বলেছিল কিন্তু দুজনে অনেক লাফিয়ে-ঝাঁপিয়েও ওই ঘুলঘুলির নাগাল পায়নি। অগত্যা সারা দুপুর বিশ্রাম শিউপূজনের খাটিয়ায়।

সন্ধ্যার মুখে শিউপূজন ফিরল। ফিরে স্নান-টান সেরে আবার রান্না করতে বসল। রান্নার পর অবশ্যই রূপু আর যমুনাও বাদ পড়ল না। তারপর শিউপূজন মস্ত বালতিটা নিয়ে জল আনতে যাবে। অসতর্কভাবে যেই দরজাটা একটু ফাঁক করেছে, যমুনা বলল, 'এই, এবার!' অমনি তারা বালতির তলা দিয়ে গলে দে দৌড়। শিউপূজন বালতি রেখে অনেক ডাকল, 'ও পুষু! ও সোনা-মোনা! ফিরে আয়, বাবা। ফিরে আয়।'

রূপুর মন খারাপ লাগছিল কিন্তু যমুনা এক ধমক লাগাল, 'ফিরে তাকিও না আর। আমার বন্দি হতে ইচ্ছা নেই।' অগত্যা ওরা দুজনে গেল মুক্ত জীবনের সন্ধানে।

(ক্রমশ)

ছবি : শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

[বিদেশি গল্পের ছায়া অবলম্বনে]

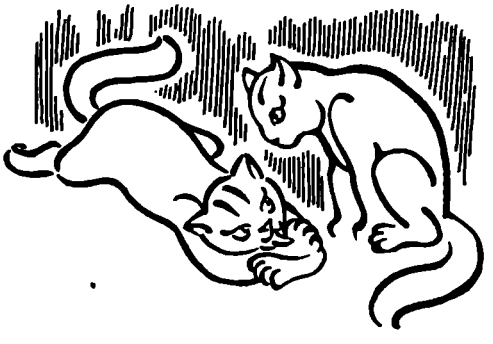

অসাধারণ সেনাপতি

দীনবন্ধু হাজরা

ট্রেঞ্চের ধারে বসে আছেন সেনাপতি। মুখে তাঁর বরাবরের অতি প্রিয় সিগারেট। হঠাৎ শত্রু এলাকা থেকে 'অ্যাকশন' শুরু হয়ে গেল। দেহরক্ষীরা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল, 'স্যার তাড়াতাড়ি নিরাপদ আশ্রয়ে চলে আসুন। চারিদিকে বৃষ্টির মত গোলা পড়ছে। শেল ফাটছে। দয়া করে আপনি উঠে আসুন, সেলটারে আশ্রয় নিন।'

যুদ্ধক্ষেত্রে ধূমপান-করা একদম নিষেধ। এই সেনাপতি কিন্তু থোড়াই কেয়ার করেন ওসব নিয়ম-কানুনের। প্যাকেট থেকে আর-একটা সিগারেট বার করে লাইটার জ্বেলে ধরিয়ে নিলেন সেটা কমান্ডার সাহেব। উদাস ভাবুকের মতো একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'চলে যাব? দূর, তাও কি হয়? ওরা বলবে, কামাল কাপুরুষ।'

সেনাপতি উঠলেন না। স্বচ্ছন্দে সেইখানেই বসে বসে সিগারেট টানতে লাগলেন। চারিদিকে তখনও তেমনই গোলা এসে পড়ছে, সেল ফাটছে — বৃষ্টির মতো। মাঝে অক্ষত অবস্থায় দিব্যি বসে আছেন কামাল পাশা—কামাল আতাতুর্ক।

শোনা যায় নেপোলিয়ন এবং নেতাজির মধ্যেও যুদ্ধক্ষেত্রে এই ধরনের আশ্চর্য শক্তি দেখা গিয়েছিল।

এ-শক্তির রহস্যের মূলে কী ছিল? আজও কেউ উদঘাটন করতে পারেনি। কোনো অলৌকিক শক্তি? অসাধারণ মনোবল? নাকি আর কিছু?

সেকথা শুধু কামাল পাশাই জানতেন। জানতেন নেপোলিয়ন আর নেতাজির মত মহান সেনাপতিরা।

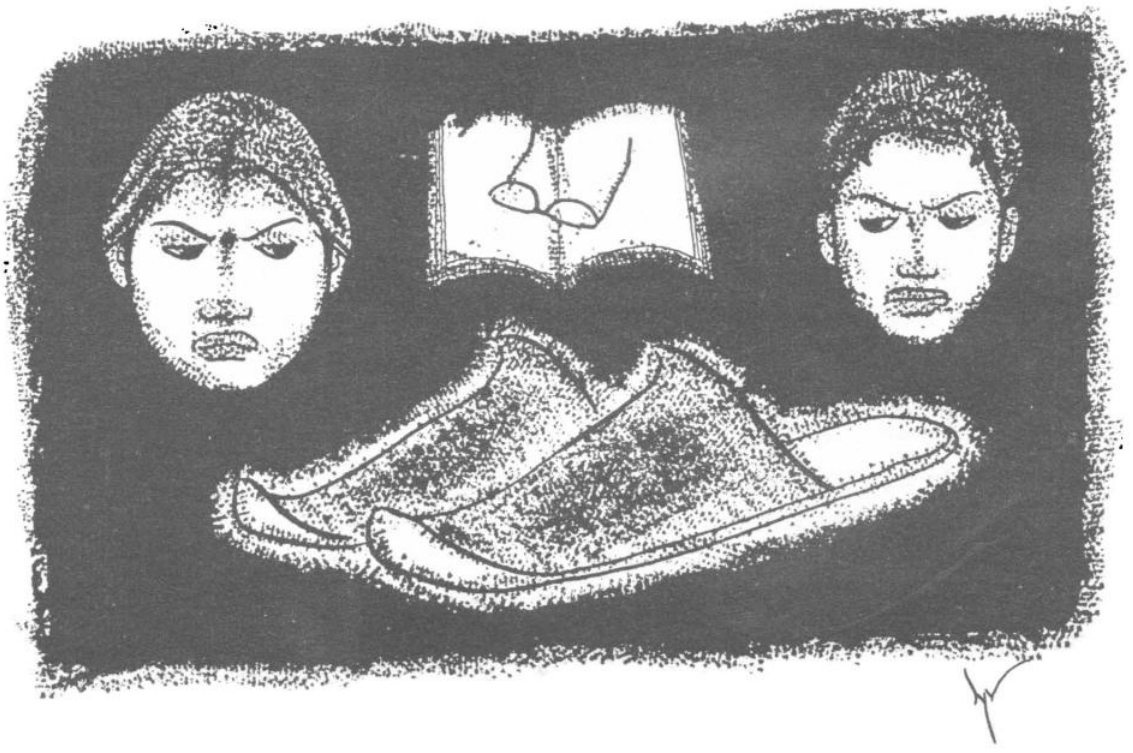

সেই চটিজোড়া

রাজকুমার রায়চৌধুরী

বাবার সুটকেসের মধ্যে একটা পুরোনো হলদে হয়ে যাওয়া খবরের কাগজে মোড়া ছিল চটিজোড়াটা। চটিটা সম্পর্কে কিছু বলার আগে সুটকেসের ইতিহাসটা বলে ফেলা ভালো।

বাবা মারা যাবার পর সম্পত্তির মধ্যে আমি পেয়েছিলাম এই সুটকেসটা। অবশ্য সম্পত্তি বলতে বাবা কিছুই রেখে যেতে পারেননি। অল্প বয়সেই চাকরিতে ঢুকেছেন, তারপর বিয়ে করেছেন। সামান্য সরকারি চাকরিতে চার ছেলে-মেয়ে মানুষ করতেই হিমসিম খেয়ে যেতে হয়, কাজেই সম্পত্তি রেখে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। তবে আমি জানি যে এই সুটকেসটা বাবার খুব প্রিয় ছিল। যৌবন বয়সে বাবা এটা আগ্রা থেকে কিনেছিলেন। ভালো চামড়ার তৈরি, উপরে পেতলের বেনারসি কাজ।

এক সময়ে বাবার সাহিত্য চর্চার বেশ সখ ছিল। সংসারের চাপে পড়ে সে সাহিত্যচর্চা বেশি দূর এগোয়নি। তবে তখনকারক কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় বাবার কিছু গল্প-কবিতা ছাপা হয়েছিল, আর অনেক পাণ্ডুলিপি জমা থাকত এই সুটকেসটায়।

আমি একটু-আধটু সাহিত্যচর্চা করি বলে সুটকেসটা আমি পেয়েছি। এতদিন অফিসের কাজের চাপে সুটকেসটা খুলে দেখা হয়নি। আজকে হঠাৎ একটা ছুটি পাওয়ায় সুটকেসটা খুলে একটু নাড়াচাড়া করছিলাম। ভাবছিলাম বাবার কয়েকটা লেখা ঘষে-মেজে এখনও হয়তো ছাপানো যায়। পাণ্ডুলিপিগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎ চটিজোড়াটা চোখে পড়ল। সেই হলদে হয়ে যাওয়া কাগজে মোড়া চটিজোড়া। অবশ্য এটার কথা আমরা বাবার মুখে আগেই শুনেছিলাম।

বাবার এক বন্ধু সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করেন। তাঁর গুরুর কাছ থেকে পাওয়া এই চটিজোড়া তিনি বাবার কাছে রেখে যান। তাঁর শেষ অনুরোধ ছিল তিনি যদি দশ বছরের মধ্যে না ফেরেন তবে এই

চটিজোড়া বাবা যেন কোনো যোগ্য লোকের হাতে (বা পায়ে) দেন। এখানে যোগ্য লোক কথাটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাবার বন্ধু কালিকাপ্রসাদবাবু বিশ্বাস করতেন যে এই চটিজোড়ার একটা বিশেষ গুণ আছে। কী গুণ সেটা অবশ্য তিনি বাবাকে বলেননি। দশ বছর ছেড়ে কুড়ি বছর হয়ে গেছে তিনি আর ফেরেননি। বেঁচে আছেন কিনা তাই বা কে জানে। বাবাও বোধহয় চটিজোড়ার কথা ভুলে গিয়েছিলেন কিংবা হয়তো তেমন যোগ্য লোকের সন্ধান পাননি বলে চটি জোড়াটা এই সুটকেসেই রয়ে গেছে।

আম চটি দুটো ভালো করে দেখলাম। দেখে তো বিশেষ কিছু মন্ত্রপূত চটি বলে মনে হয় না। চটি পরে একবার হাততালিও দিলাম, যদি গুপি-বাঘার চটির মতন হয়, তো বেশ মজা হবে— বিনে পয়সায় নানা জায়গায় ঘোরা যাবে, রেলের টিকিটের যা দাম! কিন্তু দেখলাম চটির ওরকম অলৌকিক গুণ কিছুই নেই। দেখতেও বেশ সাধারণ। আগেকার দিনের শুঁড় তোলা বিদ্যাসাগরি চটি। ভাল চামড়ার তৈরি, এককালে, বেশ সৌখিন ছিল বোঝা যায়, তবে কালের প্রভাবে বিবর্ণ হয়ে গেছে।

চটিজোড়াটা আবিষ্কার করার পর ওটা নিয়ে কয়েকদিন আর মাথা ঘামাইনি। পরের রবিবার হঠাৎ চটিটার কথা মনে পড়ল। ছুটির দিন খাবার পর ডিটেকটিভ গল্পের বই নিয়ে ইজিচেয়ারে বসে পড়ার অভ্যেস আমার অনেক দিনের। আজ একটা এলারি কুইনের বই নিয়ে বসেছি। কী মনে হল হঠাৎ চটিজোড়াটা পায়ে পরে নিলাম, বেশ ফিট করেছে দেখলাম। কিছুক্ষণ পরে কেন জানিনা ডিটেকটিভ গল্প আর ভাল লাগছিল না, অথচ বেশ জমাটি থ্রিলার। পায়ে পায়ে বইয়ের আলমারির কাছে গেলাম। বাবার সংগ্রহ করা বেশ কিছু গুরুগম্ভীর বই আছে আলমারিতে, সেগুলো কোনোদিন পড়া হয়নি। কী মনে হল, কান্টের একটা দর্শনের বই নিয়ে বসলাম। যখন বি. এ. ক্লাসে কান্টের দর্শন পড়ার চেষ্টা করেছি তখন বইয়ের পাতা খুললেই ঘুম পেয়ে যেত। কোনমতে নোটবই পড়ে পাশ করেছি বলা চলে। আশ্চর্য, আজকে বইটা খুলতেই বিষয়টা বেশ স্বচ্ছ হয়ে এল। আর বেশ ইন্টারেস্টিংও লাগছে দেখলাম। আপশোষ হল, বইগুলো আগে কেন পড়িনি এই ভেবে। মনের মধ্যে কিন্তু একটা সন্দেহ ঘুরপাক খেতে লাগল। আমি চটিজোড়াটা খুলে ফেললাম। একটু পরেই কান্ট আবার দুর্বোধ্য হেঁয়ালির মতন লাগল। কান্ট ছেড়ে আবার এলারি কুইনের বইটা টেনে নিলাম। কে খুনী জানার জন্য তন্ময় হয়ে পড়তে লাগলাম, কখন যে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেল টেরই পেলাম না।

সেদিনের ঘটনার পর বেশ কয়েকদিন কেটে গেছে। চটির ব্যাপারে আমি কাউকে কিছু বলিনি। তবে চটিজোড়া বইয়ের তাকের নীচেই রেখে দিয়েছি। খুব একটা ব্যবহার করি না। বেশ বুঝে গেছি ও চটির যোগ্য আমি নই। চটি পায়ে দিয়ে সার্ত্রে, কামু, কাফকা, এমন কি দেরিদা পযন্ত পড়ে ফেলেছি, কিন্তু চটি খুললেই এক্‌জিস্‌টেনসিয়ালিজ্‌ম্‌ কী জিনিস তা একদম মাথায় ঢোকে না।

চটি পরে সেদিন কোপেনহাগেন ইন্টারপ্রিটেসন্‌ অব কোয়ান্‌টাম মেকানিকস্‌ চমৎকার বুঝেছিলাম কিন্তু পরে বিকেলে প্রফেসর পালিতের সঙ্গে তর্ক করতে গিয়ে সব কেমন যেন গুলিয়ে গেল। তখন অবশ্য পায়ে ছিল নতুন কাবলিটা। সেদিন বেশ অপদস্থ হয়েছিলাম।

আজ চটি না পরে দুপুরে পূজাবার্ষিকীর গল্পগুলো পড়ছি, কিন্তু শান্তিতে পড়বার কী যো আছে! আমার একমাত্র পুত্র শ্রীমান বাচ্চু তার টেপরেকর্ডারে 'ওজোন হোল' বলে একটা নতুন পপ্‌ গ্রুপের গান শুনেছিল, যন্ত্রটা যত জোরে বাজানো সম্ভব, তত জোরেই সেটা বাজাচ্ছে। গোটা দশেক বেড়ালকে নিমের পাঁচন খাইয়ে তাদের গলায় ঘণ্টা আর পায় নূপুর বেঁধে প্রচণ্ড গরম টিনের উপর ছেড়ে দিলে তাদের আর্তনাদের এবং ঘণ্টা ও নূপুরের সম্মিলিত যে আওয়াজ হবে পপ্‌ মিউজিকের গানটা সেরকমই চিত্তাকর্ষক।

আমি বাচ্চুকে ধমক দিয়ে দেখেছি, কোন ফলই হয় না। উল্টে ওর বক্তব্য :

(১) কবে আমি ওকে ওয়াকম্যান কিনে দিচ্ছি?

(২) পাশের ঘরে আরও জোরে গানটা বাজাবে।

(৩) রাগ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে, ফিরবে অনেক রাতে।

টিন-এজাররা নাকি খুব সেনসেটিভ, ওদের বকাবকি করা উচিত নয়। এটা অবশ্য প্রফেসর পালিতের অভিমত। যাই হোক, আজকে আমি আর বকাবকির মধ্যে গেলাম না, যতটা সম্ভব নরম গলায় ওকে ডাকলাম। বাচ্চু বেশ বিরক্তির সঙ্গেই এল। আর এক প্রস্থ গালাগাল শুনতে ও যে খুব উৎসুক নয় সেটা ওর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। আমি ওকে বললাম, 'তুই এই চটিজোড়াটা পরে গান শোন, তোর ভালো লাগবে।'

বাচ্চুর প্রবল অনীহা, ভাবল এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন প্যাঁচ আছে। যাই হোক, অনেক বুঝিয়ে বললাম। কুড়িটা টাকা ঘুষও দিলাম। চটি পরে সে গান শুনতে চলে গেল। পাঁচ মিনিট সেই বিকট শব্দ ধৈর্য ধরে শুনলাম, ভাবলাম চটিও এবারে কোন কাজ দিল না। কিন্তু না, ঠিক পাঁচ মিনিট পরে বাচ্চু এসে হাজির। বলল, "বাবা হেভি মেটাল শুনতে আর ভাল লাগছে না। তুমি সেদিন জুপিটার নাকি একটা ক্যাসেট শুনছিলে, সেটা দেবে?'

বুঝলাম চটি পরে হঠাৎ ওর মোৎসার্ট্ শুনবার ইচ্ছে হয়েছে। মনে হল আজকের দিনটা অন্তত ওজোন হোল হেভি মেটাল এদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।

দেখলাম বাচ্চুও চটির ঠিক উপযুক্ত নয়, কারণ চটি খুলে ফেললেই ও আবার ওজোন হোল, ডেড্‌ফিশ্, গার্বেজ গার্বেজ ইত্যাদি পপ্ গ্রুপের গান শুনছে। আর চটি পরতে বললে মাঝে মাঝেই আপত্তি জানায়, বলে ওসব মোৎসার্ট-ফোৎসার্ট ওর মাথায় ঢোকে না। তাছাড়া ওইসব আঁতেল মিউজিক শুনলে ওর পপ্ গানের ক্যাসেটগুলো কে শুনবে? অকাট্য যুক্তি। এরপর আমি ওকে আর এ নিয়ে পেড়াপীড়ি করিনি।

চটির ব্যাপারে বরং আমার গিন্নির রি-অ্যাক্‌শানটা বলি। আমার গিন্নি একজন বিশেষ জনপ্রিয় বাঙালি লেখকের ভক্ত। তাঁর (মানে লেখকের) এবং আমার গিন্নির মতে গড়িয়াহাটাই পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু। আমি

গিন্নিকে একবার চটিজোড়াটা পরবার অনুরোধ জানিয়েছিলাম কারণ সেই জনপ্রিয় লেখকের লেখার গুণগত মানটা জানবার আমার খুব ইচ্ছে ছিল। গিন্নি অবশ্যই এ প্রস্তাবে রাজি হননি, বলেছিলেন এরকম চালচুলোহীন জানলে আমাকে বিয়েই করতেন না। সোৎসাহে আরও বললেন, 'এসব চটি-ফটি ফালতু ব্যাপার, সবই তোমার মানসিক বিকার। বরং ডা. নন্দীর কাছে এখনই একবার যাও, মাথার চিকিৎসা করাও। নইলে পথে পথে পাগল হয়ে ঘুরতে হবে।'

এরপর আর গিন্নীকে অনুরোধ করার অর্থই হয় না। আজ ভাবলাম চটিটা পরে আইনস্টাইনের জেনারেল থিয়োরি অব রিলেটিভিটিটা বুঝবার চেষ্টা করি। সেদিন গুণেন খুব বারফাট্টাই মারছিল। এখনও নাকি পৃথিবীতে পঞ্চাশ জনের বেশি এ থিওরি বোঝে না। ও অবশ্য নিজেকে পঞ্চাশ জনের একজন বলে মনে করে। যাই হোক চটিজোড়াটা আনতে গিয়ে খুঁজে পেলাম না। বইয়ের আলমারির তলায় নেই। বাচ্চুর ঘরেও নেই। বাচ্চু কিছু বলতেই পারল না।

গিন্নীকে জিজ্ঞেস করতে কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বললেন, 'ও আপদ বিদেয় হয়েছে।'

আমি বললাম, 'সেকি? ফেলে দিয়েছ নাকি!'

'না'

'তবে?'

'জমাদারকে দিয়েছি।'

'সেকি?' আমি বেশ রেগেই গেলাম। 'যদি ওটা ও ডাস্টবিনে ফেলে দেয়!'

'তা দিলে তো ল্যাঠাই চুকে যেত।'

চটিটা সম্পর্কে গিন্নির এত রাগ তা জানতাম না। কিন্তু পরে যা বললেন তাতে আমি আরো বিস্মিত হলাম। চটিটা নাকি জমাদারের পায়ে দারুণ ফিট করেছে। ও দশ টাকা ধার নিয়েছে সিনেমা দেখবে বলে। তাও আবার নন্দনে।

'নন্দনে?' আমি প্রশ্ন করলাম বটে কিন্তু খুব একটা অবাক হলাম না। 'কোন্ সিনেমা?'

'ফেলিনি না ফেলেছি কার যেন একটা অদ্ভুত নামের বই। সাড়ে সাত বোধহয়।' গিন্নির ইন্টেলেকচুয়াল সিনেমা সম্পর্কে খুব একটা উৎসাহ নেই।

'সাড়ে সাত না সাড়ে আট?'

'হ্যাঁ, বোধহয় সাড়ে আটই হবে।'

'এইট অ্যান্ড হাফ' আমি মনে মনে বিড়বিড় করে উচ্চারণ করলাম। চটির সাইজটাও ৮½। বেশ বুঝলাম চটিজোড়া এবার যোগ্য লোকের হাতেই (বা পায়েই) পড়েছে।

ছবি : সায়ন চক্রবর্তী

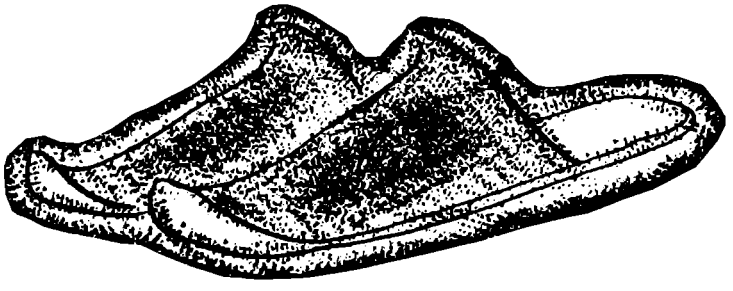

অঙ্কের মজা!

স্বপ্নাভ রায়চৌধুরী

এবারে টুসির বায়না, অত বীজগণিত বা জ্যামিতি চলবে না। নিখাদ পাটিগণিত চাই, রীতিমতো কর গুণে যাতে ফ্যালাসির সমাধান করা যায়।

বেগতিক। হাতের কাছে তেমন স্টক নেই। যা মাথায় এল বলে দিলাম। বললাম, 'শোন, তোর বাড়িতে দশটা ব্যাগ এসেছে। তার প্রত্যেকটার মধ্যে দশটা করে গুলি আছে। প্রত্যেকটা গুলির ওজন ১০ গ্রাম। তুই ব্যাগগুলো নিয়ে নিবি। হঠাৎ খবর এল, ওর মধ্যে যে কোনও একটা ব্যাগে কম ওজনের গুলি আছে। ৯ গ্রাম করে। এবার বলতো, মাত্র একবার ওজন করে কীভাবে বার করবি কোন ব্যাগটার ওজন কম?'

টুসি দুয়ো দিল। বলল, 'বাজে একটা পুরোন ফ্যালাসি। সোজা। প্রথম ব্যাগ থেকে একটা গুলি, দ্বিতীয়টা থেকে দুটো, তৃতীয়টা থেকে তিনটে— এইভাবে, দশ নম্বর ব্যাগের দশটাই গুলি নেব। ওজন করব। মোট ওজন হওয়া উচিৎ ১০ + ২০ + ৩০ + ... + ১০০ = ৫৫০ গ্রাম। যদি ১ গ্রাম কম হয়, বুঝব প্রথম ব্যাগটার গুলির ওজন ৯ গ্রাম করে। যদি ২ গ্রাম কম হয়, বুঝব দ্বিতীয়টা। ৩ গ্রাম কম হলে, তৃতীয় ব্যাগ।'

বললাম, 'ওকে। বড্ড সোজা হয়ে গেছে। বুঝতে পারছি। ঠিক আছে। এবার বল তোকে ১২টা বল দেওয়া হল। একইরকম দেখতে। এদের মধ্যে ১১টা বলের ওজন সমান। একটা বলের ওজন কিছু কম অথবা কিছু বেশি। বলে দেওয়া নেই, কম, না বেশি। মাত্র তিনবার দাঁড়িপাল্লার এদিকে ওদিকে বল রেখে, কোনো বাটখারার সাহায্য ছাড়া ওজন করে বের করতে পারবি কোন বলটার ওজন বেশি অথবা কম?'

টুসি ভাবতে বসল।

তোমরা দেখবে নাকি? এটা কিন্তু বেশ জটিল। চেষ্টা করো। পারলে, জানাও। যার উত্তর ঠিক হবে পরের সংখ্যায় তার নাম বেরোবে।

গত সংখ্যার উত্তর

AB এবং AC যদি বৃত্ত দুটির ব্যাস হয়, তাহলে, BC রেখাটি সবসময়েই F বিন্দু ছেদ করে যাবে। সুতরাং, D এবং E বিন্দুর কোনও অস্তিত্ব নেই। তাই, দুটি লম্ব-রও অস্তিত্ব নেই। শুধুমাত্র আঁকার কারসাজিতেই এই ফ্যালাসি।

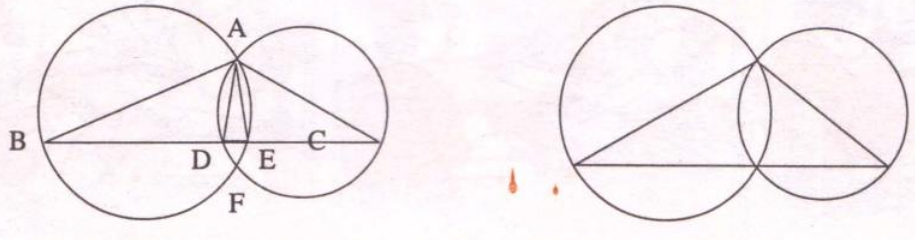

নন্দ গুপীর নন্দ কপাল

দিলীপ দাস

এদিকে পড়া চলতে থাকুক আর আমরা বাইরে গিয়ে খেলতে থাকি।
....দেহ গঠনে অংশ-গ্রহণ করে এবং দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা...
ওকি! মাঠে ওরা কারা, নন্দ-গুপী না? তাহলে ঘরে পড়ছে ও কাদের গলা?
হুম. এই ব্যাপার!
...গড়ে তোলে, সেই জৈব রাসায়নিক...
বলতো গুপী, আমরা এখন খেলছি না পড়ছি? হিঃ হিঃ হিঃ।
আমরা এখন পড়ছি। হাঃ হাঃ হাঃ।
এভাবে আমাদের পড়া কতক্ষণ চলতে পারে নন্দ?
যতক্ষণ চাইব। খালি মাঝে মাঝে রিওয়াইণ্ড করে দিয়ে আসতে হবে। চল, এখন একবার করে দিয়ে আসি।
শোনো নন্দ-গুপী – তোমাদের এই কসরতের জোরে পড়াশোনায় মন দাও। আজ আর কিছু বললাম না। ইতি— তোমাদের একজন শুভচিন্তক।
আরে!
এ-এতো জেঠুর গলা!
বুঝতে যখন পেরেছো তখন টেপ রেখে বই নিয়ে বসে পড়। আর রিওয়াইণ্ড করতে যেও না।
কেমন জব্দ!

সান্টা ক্লজ ও তাঁর বল্গা হরিণেরা

সারা দুনিয়ার ছেলেমেয়েরা জানে যে ডিসেম্বর মানেই খ্রিস্টমাস আর খ্রিস্টমাসে সান্টা ক্লজ ছোটোদের জন্য উপহার নিয়ে আসেন বল্গা হরিণে টানা স্লেজ গাড়িতে। অবশ্য সান্টার উপহার পেতে হলে নাকি লক্ষ্মী হতে হয়, দুষ্টু ছেলেমেয়েদের সান্টা ভালবাসেন না।

কিন্তু একথা ক'জন জানে যে সান্টার কিংবদন্তি মাত্র ২০০ বছরের পুরোনো? চতুর্থ শতকে স্মার্নাতে বিশপ নিকোলাস গরিব ছেলেমেয়েদের ভালোবেসে উপহার দিতেন। হল্যান্ডে সেন্ট নিকোলাসের নাম হয়ে যায় সিন্টার ক্লাস আর ১৯ শতকে আমেরিকায় তা হয়ে যায় সান্টা ক্লজ। ১৮০৯ সালে ওয়াশিংটন আরভিং-এর একটি গল্প আর ১৮২৩ সালে মুর-এর একটি কবিতা থেকে আমেরিকায় তাঁর স্থান প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। ১৮৬০-এর দশকে হার্পার্স ম্যাগাজিনে নাস্ট আঁকেন সান্টার ছবি, যে চেহারার সঙ্গে আমরা পরিচিত— মোটাসোটা চেহারা, সাদা দাড়ি, লাল ঢোলা আলখাল্লা পরা, মাথায় পমপম লাগানো টুপি, কাঁধে উপহারের ঝোলা, সঙ্গে আটটা বল্গা হরিণে টানা স্লেজ গাড়ি।

দিনে দিনে কিংবদন্তি বেড়ে চলল। সান্টা থাকেন কোথায়? নিশ্চয়ই উত্তর মেরুতে। ১৯২৭ সালে বলা হয় সান্টার বাড়ি ল্যাপল্যান্ডে কোরভাটুনটুরিতে। ১৯৫০-এর দশকে বলা হল সান্টার বাড়ি রোভানিয়েমিতে। সেখানেই তাঁর খেলনার কারখানা আর বাড়ি, যেখানে তাঁর গিন্নি নানান রকমের রান্না করেন। সান্টার গিন্নিকে চোখে কেউ দেখেনি, কিন্তু তাঁর গেরস্থালির কাজে আর সান্টার খেলনার কারখানায় সাহায্য করে যারা, তারা এল্‌ফ বা ছোটো পরী। সান্টার বল্গা হরিণদের দেখাশোনাও করে এই এল্‌ফরা। কিংবদন্তি অনুসারে সান্টার বল্গা হরিণদের নাম ডন্ডার, ডান্সার, প্রান্সার, ড্যাশার, ব্লিৎজেন, ভিক্সেন, কমেট আর কিউপিড। কিন্তু ১৯৩৯ সালে গান লেখা হল Rudolph, the Red-nosed Reindeer আর তারপর থেকেই রুডল্‌ফের নাম জগৎ-বিখ্যাত। রোভানিয়েমিতে সান্টাকে নিয়ে ট্যুরিজম জমে উঠেছে— পথেঘাটে ঘুরছেন ডজন ডজন সান্টা। পোস্টাপিসে জমে উঠছে সান্টাকে পাঠানো চিঠি আর টেলিগ্রামের স্তূপ। তোমরাও পাঠিয়েছ নাকি? সম্প্রতি সান্টাও হাই-টেক হয়েছেন— www.santaclaus.com ওয়েবসাইটে গিয়ে তাঁকে চিঠি লিখলেই উত্তর আসে চটপট।

অবশ্য সান্টার বল্গা হরিণরাও কম আশ্চর্য প্রাণী নয়! উত্তর মেরুকে বেড় দিয়ে আলাস্কা, কানাডা, গ্রিনল্যান্ড থেকে স্ক্যান্ডিনেভিয়া ও সাইবেরিয়াতে এদের বাস। আমেরিকায় এদের বলা হয় ক্যারিবাউ। ল্যাপল্যান্ড ও সাইবেরিয়াতে বল্গা হরিণ পোষ মানানো হয়েছে কিন্তু এস্কিমোরা ক্যারিবাউকে পোষ মানাতে পারেনি। এরা আকারে বড়ো, ওজনে ১৫০-৩০০ কেজি আর বেশ শক্তিশালী। এরা অন্যান্য হরিণের মতন নয়— এদের স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই শিং গজায়, পুরুষ বল্গা হরিণের শিং শীতকালে খসে যায়। তবে কি সান্টার হরিণরা সবাই মহিলা? এদের পায়ের খুরের তলাটা চ্যাপ্টা— গ্রীষ্মে তুন্দ্রার নরম ভিজে মাটিতে স্নিকার জুতোর মতন, আর শীতের বরফে ঢাকা তুন্দ্রায় স্নো-বুটের মতন। শীত আটকানোর জন্য এদের গায়ে চর্বির আবরণ আর উপরে দুই স্তরে লোম, মাঝখানে বাতাসের স্তর ইন্‌সুলেশনের কাজ করে। এদের দেহ এত হাল্কা যে জলে এরা শরীরের দুই-তৃতীয়াংশ ডুবিয়ে ভেসে থাকতে পারে, সাঁতারেও খুব দড়। সান্টার যোগ্য বাহন বটে!

এত সত্ত্বেও চিন্তা এই যে, এ বছর ফিনল্যান্ডে মোটে বরফ নেই। বরফ না থাকলে খ্রিস্টমাস জমবে কেমন করে? বল্গা হরিণের স্লেজই বা ছুটবে কী করে আর সান্টা ক্লজ কোম্পানির ব্যবসা আদৌ জমবে কী?

গল্পসল্প

রেবন্ত গোস্বামী

আমার এক দাদার ছোটোবেলায় ডাকটিকিট জমানোর একটা খাতা ছিল। প্রচুর ডাকটিকিট সংগ্রহও করা হয়েছিল। একদিন খাতাটা যে কোথায় গায়েব হয়ে গেল, তার আর হদিস মিলল না। ডাকটিকিট জমানোর আগ্রহেরও হল ইতি। জানি, তোমরা বলে উঠবে, এটা আর নতুন কী? অনেকেরই তো ডাকটিকিট নামানোয় হবি থাকে।

হ্যাঁ, এই হবি-র কথাই বলা হচ্ছে। শব্দটার ঠিক বাংলা পরিভাষা নেই। শখ? নেশা? বাতিক, না খেয়াল? যাই হোক, 'হবি' (hobby) ব্যাপারটা কিন্তু ষোলোআনাই ভালো। কলকাতার একজন প্রখ্যাত হৃদ্‌বিশেষজ্ঞ বলেছিলেন, একটা হবি বয়স্ক বা অবসরপ্রাপ্ত লোককে শরীর ও মনে সুস্থ রাখে। শব্দটার তাৎপর্যই তো তাই। কেবলমাত্র আনন্দের জন্য এবং মনকে চাপমুক্ত রাখার জন্যই হবি। পেশা বা অর্থকরী দিকের বাইরে, কোনও বাধ্যবাধকতা ছাড়া সেটা যা-কিছু হতে পারে— গানবাজনার চর্চা বা শোনা, বইপড়া, বাগান করা, খেলাধুলোর খবরাখবর রাখা, অল্পস্বল্প লেখালেখি করা, তাস-দাবা খেলা, এমন কী শব্দজব্দের সমাধান করা— যে-কোনো। এক বা একাধিক হবি থাকতে পারে কারও।

অবশ্য এসবের বাইরে অন্যরকমেরও হবি থাকে। আমার ছোটোবেলায় কয়েকজন বন্ধুকে দেখেছি, তারা বিভিন্ন কোম্পানির দেশলাইয়ের লেবেল বা সিগারেটের প্যাকেট জমাত। পরে অবশ্য একটু 'বড়ো' হয়ে ছেলেমানুষি ভেবে সব ছুঁড়ে ফেলেছে। থাকলে সেসব তুচ্ছ জিনিসও ওইসব শিল্প সম্বন্ধে কিছু তথ্য জোগাত। মনে পড়ে, 'পাসিং-শো' নামে টুপিওয়ালা সাহেবের মাথার ছবিওয়ালা একটা সিগারেট ছিল। তখন বিস্কুট, সিগারেট এসব টিনের বাক্সেও পাওয়া যেত। ঠিক জুতোর বাক্সের আকারের। কিছুদিন আগেও সিনেমা হলের মধ্যে ছবি শুরুর আগে সেই সিনেমার পাতলা বই ঘুরে ঘুরে দর্শকের কাছে বিক্রি হত দু-চার আনা দামে। তাতে প্রচ্ছদে ও ভেতরে সেই সিনেমার কয়েকটি ছবি, তার অভিনেতা, অভিনেত্রী, কলাকুশলীদের নাম, বেশ নাটকীয়ভাবে লেখা সিনেমার সংক্ষিপ্ত গল্প— অবশ্যই শেষ পরিণতিটা না বলে ('তারপরে কী হল? জানতে পর্দায় দেখুন।') ছবির সবকটি গান, সবই সেই বইয়ে ছাপা থাকত। একজনের সংগ্রহে দেখেছিলাম, বাংলা সিনেমার প্রায় প্রথম যুগ থেকে জমানো বিখ্যাত, অখ্যাত, ভুলে-যাওয়া নানান বাংলা সিনেমার বই। বাড়ি বদলানোর সময় নাকি সব ঝেঁটিয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। এগুলো থাকলে যাঁরা সিনেমা-সংক্রান্ত গবেষণা চর্চা করেন, তাঁরা হয়তো হাতে স্বর্গ পেতেন। এসব হয়তো আগে থেকে ভেবেচিন্তে করা হয় না। আপনা-আপনিই হয়ে যায়।

প্রাচীন বা দেশবিদেশের মুদ্রা, পুরোনো বইয়ের দোকান থেকে কেনা দুষ্প্রাপ্য বই, পুরোনো এবং বিভিন্ন ধরনের মূর্তি থেকে শুরু করে কলম, দোয়াত, এমনকী পেপারওয়েট পর্যন্ত জমানোর হবিগ্রস্ত লোকের অভাব নেই। প্রাচীনত্ব বেশি হলে বা দুষ্প্রাপ্য কিছু হলে সেগুলো যে কত অমূল্য জিনিস হয়ে যায়, তার প্রমাণ তো এসব নিয়ে লেখা অগুনতি গোয়েন্দা গল্পেই পাওয়া যায়। জাহাঙ্গীরের মুদ্রা, নেপোলিয়ানের চিঠি, প্রাচীন পুঁথি বা ছবি তখন আর নিরীহ থাকে না। প্রয়াত বিখ্যাত-অভিনেতা বসন্ত চৌধুরীর হবি ছিল বিভিন্ন গণেশমূর্তি ও মুদ্রা সংগ্রহ করা। শুনেছি, মৃত্যুর আগে সবই কোনো সংগ্রহালয়ে দান করে যান। আমাদের বন্ধু ছড়াকার দীপ মুখোপাধ্যায় দেশবিদেশের নানান ধরনের প্যাঁচার মূর্তি সংগ্রহ করে ঘর ভরেছেন। এককালে (এখনও কি?) গ্রামে কোনও রিকেট রোগ হলে ওঝা এসে বলত, পেঁচোয় পেয়েছে। সেটা না হয় কুসংস্কার। কিন্তু এই বয়সে প্যাঁচায় পাওয়া! প্যাঁচাই শুধু নয়, পাখি কীটপতঙ্গ গাছপালার হবি নিয়ে কত প্রকৃতিপড়ুয়া ঘুরে বেড়াচ্ছেন মাঠেঘাটে জঙ্গলে। তাতে টাকা আসে না, বরং যায়। এটা যে হবি!

মনে পড়ে, সত্যজিৎ রায়ের ঘরে একবার সন্দেশের মিটিং হচ্ছে। এমন সময় সাহিত্যিক সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় হাজির হলেন, হাতে ১৯১৩ সালে প্রকাশিত প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা 'সন্দেশ'। বাঁধানো নয় কিন্তু। যেমন অবস্থায় সেটা ছিল, একেবারে অক্ষত। আমাদের কথা বাদই দাও। স্বয়ং সম্পাদকমশাই পর্যন্ত হতবাক। কিছু লোকের এইসব শখ, নেশা, বাতিক বা খেয়াল যাই বল, সেটা আছে বলেই তো ভাবীকাল অনেকসময় তাঁদের কাছে ঋণী হয়ে যায়।

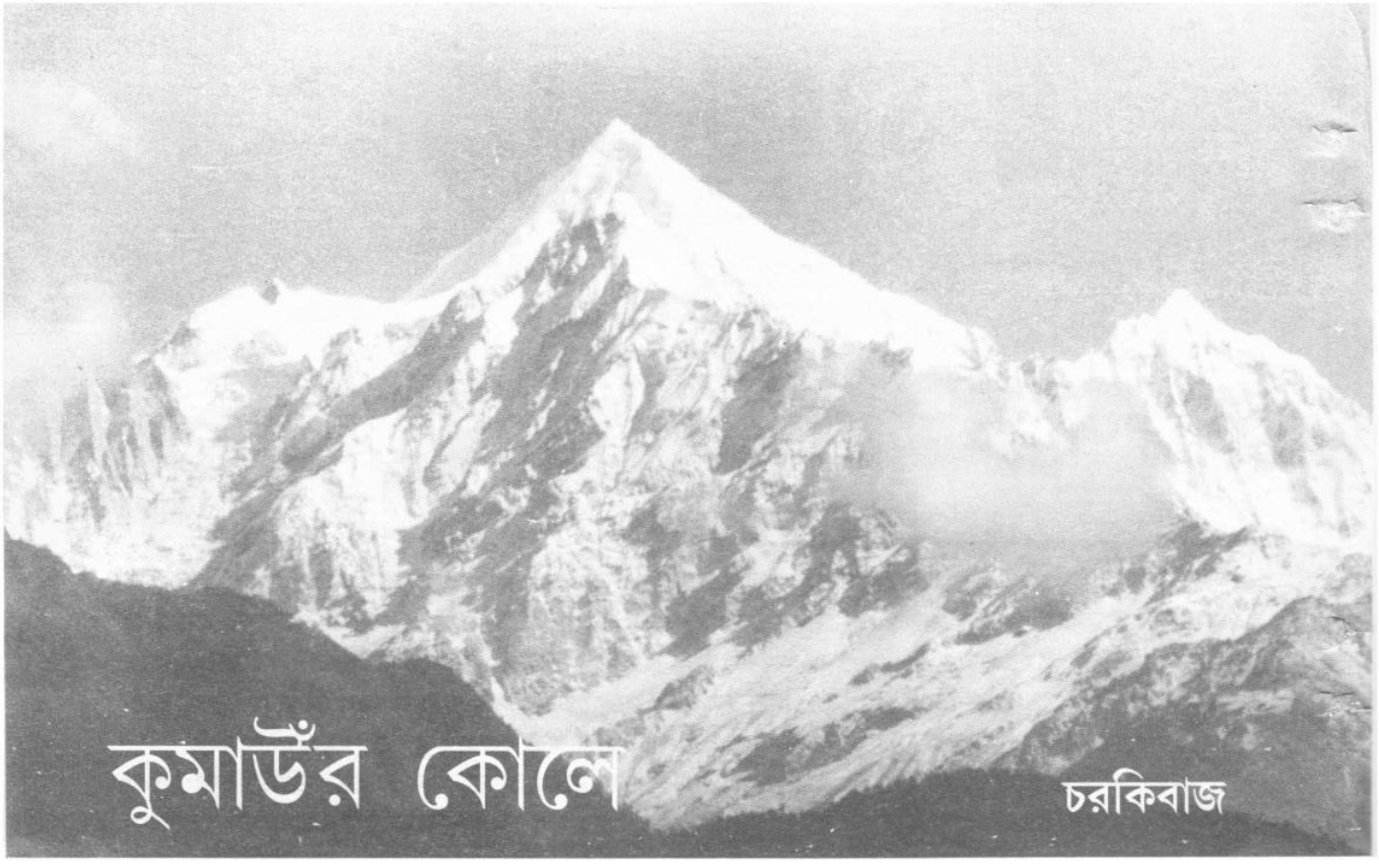

কুমাউঁর কোলে

চরকিবাজ

দুটো রাত বাঘের পেটে কাটিয়ে তৃতীয় দিন সকালে নেমে বাঁচলুম দুজনে। ছোট্ট মিষ্টি হলদোয়ানি স্টেশন আমাদের হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালে। বিজয়া দশমীর সকালের রোদে ধোয়া হলদোয়ানিতে আমাদের রেখে বাঘ এক্সপ্রেস ঝিক্‌ঝিক্‌ করতে করতে চলে গেল কাঠগোদামের দিকে।

স্টেশনের বাইরে বেরোতেই মিষ্টি রোদ আর চার মারুতির চালক ঝাঁপিয়ে পড়লে আমাদের ওপর। হলদোয়ানি ফুরোতে না ফুরোতেই এসে গেল কাঠগোদাম। পাহাড়ও কেমন আরো কাছ ঘেঁষে এগিয়ে এল। তারপর— পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে সেই চিরচেনা পুরনো গন্ধ, সেই মনভুলানো, চোখজুড়ানো ঠান্ডামাখা ছবির পর ছবি।

ধাক্কা খেলুম আলামোড়া পৌঁছে। রাষ্ট্রপতি আসবেন, অতএব রাষ্ট্রবাসীদের জন্য হাজারো বিধিনিষেধ, গাড়িদেরও যাতায়াতে নানান ফ্যাকড়া। মারুতিওলা তার মধ্যে ঢুকতে নারাজ। পুলিশদাদারা ভারী ভালো। আমাদের অসুবিধের কথা শুনে ওই পথে ঢুকবার 'বিশেষ অনুমতি' তো দিলই, একটা ভাড়ার গাড়িও ধরে দিল। হোটেলের ডাইনিং টেরাস থেকে দৃষ্টি মেলে দিলুম দুজনে। সে উড়তে উড়তে নীচের ঢেউখেলানো পাহাড়গুলো পেরিয়ে দিগন্ত ছুঁয়ে এল হাজারো রং মেখে। শেষবেলায় বিদায় নেবার সময় মা দুগ্‌গা আমাদের বলে গেলেন, 'মা ভৈ'। নিশ্চিন্ত হলুম।

কালামুনির কালীমন্দির

পরদিন সূয্যিমামার সঙ্গে আমরাও উঠলুম। পাশেই আধফালি বাসস্ট্যান্ড। পিথোড়াগড়ের বাস আসতে ভালো দুটো সিটে বসে পড়লুম। জানলা দিয়ে মিষ্টি পাহাড়ি বাতাস এসে আদর করতে লাগল। বাড়ি ঘরের মাথা ছাড়িয়ে সূয্যিমামা বাসের গায়ে টোকা দিতেই বাস ছাড়ল। প্রায় অদেখা আলমোড়া আড়মোড়া ভেঙে আমাদের বিদায় জানালেন। সারা গায়ে রোদের হালকা চাদর জড়িয়ে কুমাউঁর প্রকৃতি আমাদের জানালে, 'তোমরা এসেছ, আমি খুব খুশি হয়েছি।'

বেলার সঙ্গে সঙ্গে বাসও গড়াতে লাগল। বাসে লোক বদল হতে লাগল— আমরা বিধাতার মতো অনড়। মাঝেমধ্যেই তুষারশৃঙ্গেরা উঁকিঝুঁকি মেরে চলেছে। নদীরা তাদের নাচ দেখিয়ে যাচ্ছে। ফুল পাখিরা রঙ ছড়াচ্ছে সবখানে। সূয্যিমামা মাথায় চড়ে বসতেই খিদেবাবাজি পেটের মধ্যে খোঁচা মারতে লাগল। বাসও বুঝি বেপারটা বুঝে দানিয়াতে দাঁড়িয়ে পড়লে। পাশেই সার সার দোকান, গন্ধ ছড়িয়ে ডাকাডাকি করছে। তারই টানে ঢুকে পড়লুম একটায়। পেট-মন দুই-ই ভরিয়ে এসে আবার ঢুকলুম বাসের পেটে। অনেক আঁকাবাঁকা পথ পেরিয়ে এসে পিথোড়াগড়ের অজস্র গাড়ি আর ধুলোভরা বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। আমরা একটা ট্যাক্সি ধরে পাহাড়ের টঙে ট্যুরিস্ট লজে পৌঁছে 'ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই' শুনে ফিরে এসে হোটেল সম্রাট-এ ফিরে এসে আত্মসমর্পণ করলুম। রাত নামতেই শান্ত হয়ে পিথড়াগড় আলো আর ভালোবাসা ছড়াতে লাগলে।

পরদিন আঁধার থাকতেই 'ধারচুলা' 'আলমোড়া', 'থল' যাবার জন্য ব্যস্থ হয়ে গাড়িরা হাঁকাহাঁকি লাগলে, 'মুনসিয়ারি' যাবার গরজ কারো আছে বলে মনে হলো না। পয়লা আঁচের চায়ের গেলাস হাতে তারই অপেক্ষায় রইলুম। সবাই এলো, সবাই গেল, শুধু 'তোমার দেখা নাই গো, তোমার দেখা নাই'।

আঁধার দূর হলো, সূর্যের আশীর্বাদ পিথড়াগড়ের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো। কেবল আমরাই আশীর্বাদে বঞ্চিত, মুনিসয়ারি কেউ যাবে না। কী হবে? সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে 'টেনশন'-ও চড়তে থাকলো। কিন্তু, যে খায় চিনি, তার যোগায় চিন্তামণি'— এক গাড়ি-ভাড়া-করা দম্পতি মুশকিল আসান হয়ে দেখা দিলেন। তাঁদের 'পার্টনার' হয়ে ঝুলে পড়লুম, থুড়ি, সেঁধিয়ে গেলুম সরস্বতী-সাদা মারুতির পেটে। বেশ কিছুদূর ফিরতি পথে এসে, পুলে চড়ে রামগঙ্গা পার করে, অন্য পথের পথিক হলুম। এবারে আমাদের সঙ্গী নীলচে সবুজ

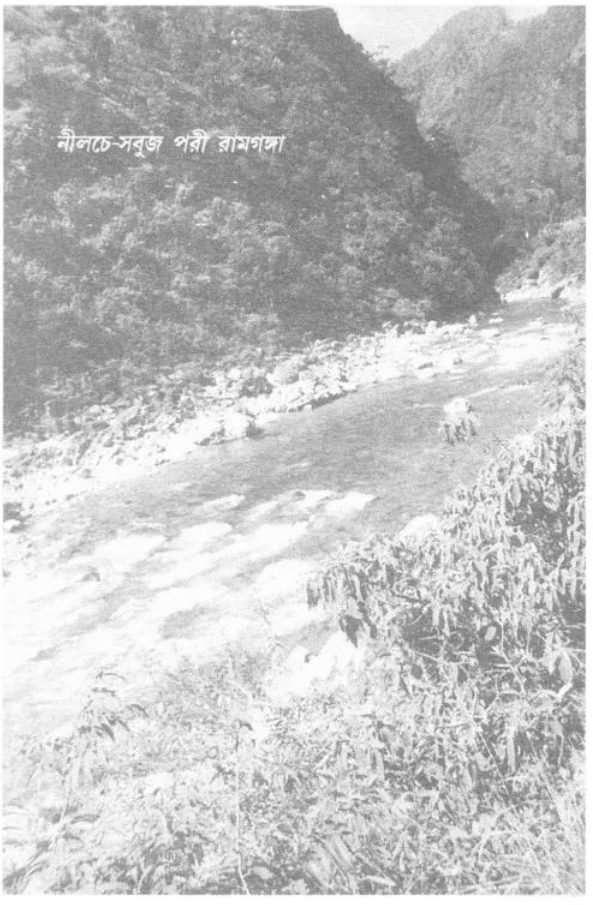

উজ্জ্বল পরী রামগঙ্গা। তাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে নিঝঝুম দিনকে সাক্ষী রেখে আমরা ছুটে চললুম রামগঙ্গার উজানে। পথে পেলুম কারগিল-শহীদের নামাঙ্কিত জলপ্রপাতকে। চারদিকের নির্জন প্রকৃতির রূপকে পাহারা দিয়ে অঝোরে ঝরে চলেছে সে। কিছুক্ষণ তার সঙ্গে কাটিয়ে আবার পথে নামলুম। তুষারচূড়ার পাহারা দেওয়া থল-এ পৌঁছে গাড়ি খানিক জল খেলো, আমরা খেলুম আলু পরোটা।

এবার পথ আরো নির্জন, আরো সুন্দর। চারদিকের অপরূপ প্রকৃতি সানন্দে শরিক হলো আমাদের আনন্দে।

দূর থেকে সবুজ পাহাড়ের গায়ে একটা সাদা পৈতে চোখে পড়ছিলো; গোটা কয়েক বাঁক ঘুরতেই সেটা দুরন্ত 'বিরথি' জলপ্রপাত হয়ে দেখা দিল। তার রূপে মুগ্ধ হয়ে গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল। আমরা ছুটলুম বিরথিকে আরো কাছ থেকে দেখব বলে। তার রূপ দেখে মন আর ভরে না। কিন্তু, যেতে তো হবেই। তাই 'আবার আসবো' কথা দিয়ে এগোলুম। বিরথি বাংলো খানিকটা অভিমানেই গুম মেরে রইলো। বেলা যত বাড়তে থাকল বন তত নিবিড় হতে লাগল।

সরলবর্গীয় সরল গাছের দল ঘনিয়ে এলে কাছে। পিচ-ছাড়া ধূসর পথের ফিতেটা এঁকে-বেঁকে উঠে নেমে চড়ে বসলে কালামুনি টপে। পঞ্চচুলি মেঘের আড়ালে মুখ লুকোলেও ছোট্ট অথচ গম্ভীর কালীমন্দির আমাদের আশীর্বাদ জানালে। সেই আশীর্বাদ মূলধন করে একসময় নেমে এলুম মনুসিয়ারির মিষ্টি বাংলার চত্বরে। আশ্চর্যের কথা, বুকিং না থাকা সত্ত্বেও থাকার ব্যবস্থাও হয়ে গেল। আঁধার হতে না হতেই মুনসিয়ারিকে ভালোবেসে ফেললুম দুজনে।

ভালো করে ভোর হবার আগেই কে যেন ঠেলে তুলে দিলে। প্রায় মেঝে ছোঁয়া জানালার শার্মির হিম মুছে বাইরে তাকিয়েই হতবাক। জানালায় টোকা দেওয়া দূরত্বে পঞ্চচুলি! আপাদমস্তক মুড়ে জানালা টপকে নেমে এলুম লনে। দুরন্ত ঠান্ডার কামড় টেরই পেলুম না পঞ্চচুলির রূপ দেখে। সূয্যিমামা উঠতেই তার রূপ গেল বদলে। দুজনে অবাক হয়ে দেখতে লাগলুম দ্রৌপদী তাঁর পাঁচটা উনুনে আগুন দিচ্ছেন।

ফোটো : রাহুল মজুমদার

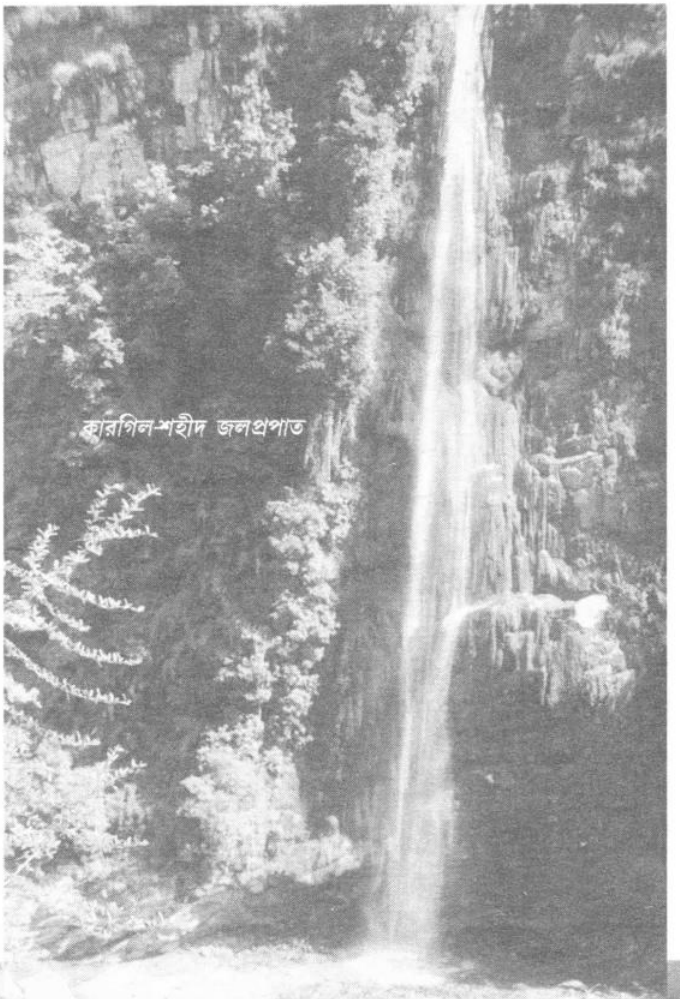

কারগিল-শহীদ জলপ্রপাত

রূপসী বিরথি

মেঠো কড়চা

এবার শীর্ষে বেলজিয়ানরা

মহিলা টেনিসে ঝড় তুলেছিলেন দুই উইলিয়ামস বোন। একের পর এক গ্র্যান্ড স্লাম প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হচ্ছিলেন সেরিনা। ফাইনালে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী অধিকাংশ সময়েই তাঁর দিদি ভেনাস। কিছুদিন হল টেনিস কোর্ট থেকে সাময়িক বিদায় নিয়েছেন দুই বোন। আর সেই সুযোগে মহিলা টেনিস সাম্রাজ্যের দখল নিয়েছেন বেলজিয়ামের দুই তরুণী— কিম ক্লিস্টার্স এবং জাস্টিন হেনিন-হার্ডিন। ২০০৩-এর মহিলা টেনিসের বর্ষশেষ প্রতিযোগিতা ডব্লু. টি. এ. টুর চ্যাম্পিয়ানশীপে বিজয়ী হয়েছেন ক্লিস্টার্স। গত বছরও এই প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়েছিলেন তিনি। মর্যাদাপূর্ণ এই প্রতিযোগিতায় ক্লিস্টার্সের আগে মাত্র চারজন খেলোয়াড় পরপর দু'বছর বিজয়ী হয়েছেন। বছরটা খুব ভালোই কেটেছে ক্লিস্টার্সের। মোট বারোটি প্রতিযোগিতার ফাইনালে উঠে নয় নয় করে ন'টিতে বিজয়ীর মুকুট পরেছেন। খুব পিছিয়ে নেই জাস্টিন হেনিনও। বর্ষশেষে ক্রম পর্যায়ে তিনি টপকে গেছেন বেশ কিছুদিন ধরে শীর্ষে থাকা বান্ধবী ক্লিস্টার্সকে। দু-দুটি গ্র্যান্ড স্লাম (ফরাসী এবং আমেরিকান) প্রতিযোগিতার ফাইনালে হেনিন হারিয়েছেন ক্লিস্টার্সকেই। এবার আমরা অপেক্ষায় থাকব কবে দুই উইলিয়ামস বোনেরা কোর্টে ফিরে আসেন। দুই আমেরিকান এবং দুই বেলজিয়ান তরুণীর লড়াইয়ে জমে উঠবে ক্লে, গ্রাস এবং হার্ড কোর্টগুলি।

শারীরিক প্রতিবন্ধকতা টলাতে পারেনি নাতালিয়াকে

ছ-বছর বয়সে সাঁতার কাটতে শুরু করেছিল দক্ষিণ আফ্রিকার নাতালিয়া ডিউটোইট। চোদ্দ বছর বয়সে কুয়ালালামপুরে কমনওয়েলথ (১৯৯৮) গেমসে অংশ নিয়েছিল। কোন পদক না পেলেও ওই কিশোরী সেদিন নজর কেড়েছিল সবার। ওকে ঘিরে স্বপ্ন দেখছিল দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রীড়াপ্রেমিকরা। কিন্তু ২০০১-এর ২৬ মার্চ সেই স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। সেদিন রোজকার মতো অনুশীলনের শেষে মোটর সাইকেলে বাড়ি ফিরছিল নাতালিয়া। ঠিক তখন একটি গাড়ি সজোরে ধাক্কা মারল ওর দ্বিচক্রযানকে। প্রাণে বেঁচে গেলেও, হাঁটুর নীচ থেকে নাতালিয়ার একটি পা কেটে বাদ দিতে হয়। ওর পরের ঘটনাটি কী হতে পারে? এক প্রচণ্ড প্রতিভাময়ীর ক্রীড়াক্ষেত্র থেকে অকাল বিদায়? কিন্তু ওই মেয়েটি অন্য ধাতুতে গড়া। দুর্ঘটনায় পা হারানোর তিন মাসের মধ্যেই সুইমিং পুলে নেমে পড়েন নাতালিয়া। শুরু হয় সংগ্রাম। ২০০২-এর ম্যাঞ্চেস্টার কমনওয়েলথ গেমস-এ প্রতিবন্ধী খেলোয়াড়দের জন্য সংরক্ষিত ৫০ এবং ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইল সাঁতারে দু-দুটি বিশ্বরেকর্ড করে স্বর্ণপদক লাভ করেন। কিন্তু শুধু সংরক্ষিত প্রতিযোগিতায় নয়। সাধারণ বিভাগেও সমান তালে টক্কর দেন নাতালিয়া। পদক না জুটলেও সম্ভ্রম আদায় করে নেন তিনি অন্য প্রতিযোগীদের কাছ থেকে। আর অতি সম্প্রতি হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত প্রথম আফ্রো-এশিয়ান গেমসের ৮০০ মিটার ফ্রি-স্টাইলে রুপো এবং ৪০০ মিটার ফ্রি-স্টাইলে ব্রোঞ্জ পদক জিতে সবাইকে চমকে দেন নাতালিয়া। এবার ওর লক্ষ্য আগামী অলিম্পিক।

চিরশ্রেষ্ঠ?

ইউরোপ এবং দক্ষিণ আমেরিকার ক্লাব-ফুটবল প্রতিযোগিতাগুলির মান খুবই উন্নত। সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফুটবলাররা অংশ নেন এই প্রতিযোগিতাগুলিতে। বিশ্বকাপ ফুটবল থেকে গুণগত মানে এই প্রতিযোগিতাগুলি পিছিয়ে নেই আদৌ। রিয়েল মাদ্রিদ, এসি মিলান, ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড, জুভেন্টাস ইত্যাদি ক্লাবগুলির অসংখ্য সমর্থক আছেন আমাদের দেশেও। কিন্তু সর্বকালের সর্বসেরা ক্লাব কোনটি? চিরশ্রেষ্ঠত্বের প্রশ্নটি সবসময়ই বিতর্কিত। সম্প্রতি পর্তুগালের জনৈক মার্সেলো লেম ডি আরুডা ক্লাব ফুটবলের সর্বকালের একটি ক্রমপর্যায় তৈরি করেছেন। সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে তৈরি তাঁর তালিকায় প্রথম স্থানটি পেয়েছে বুয়েনস আয়ার্সের বোকা জুনিয়ারস, রিয়েল মাদ্রিদ, স্যান্টোস, বায়ার্ন মিউনিখ— যাদের সংগ্রহে রয়েছে দীর্ঘ সময় ধরে সংগ্রহিত অসংখ্য ট্রোফি, তাদের টপকে বোকা জুনিয়ারস-এর প্রথম স্থান পাওয়াটা অবশ্যই বিস্ময়কর।

বলবয়

অলিম্পিক ও সেই কালো মানুষটি

নির্মলকুমার সাহা

দু'টি বিখ্যাত বই আছে। একটি হার্ট-ডেভিসের 'হিটলার্স অলিম্পিক'। আরেকটি জন ডেভিডসনের 'ওয়েন্সেস অলিম্পিক'। ১৯৩৬ সালের বার্লিন অলিম্পিককে এই দু-রকম ভাবেই দেখা যায়। ৬৭ বছর আগের সেই অলিম্পিক ঘিরে অ্যাডলফ হিটলার এবং জেসি ওয়েন্স— দু'জনেরই অনেক স্বপ্ন ছিল। ওই অলিম্পিককে সামনে রেখে ফ্যাসিস্ট হিটলার চেয়েছিলেন জার্মানি সম্পর্কে দুনিয়ার মানুষের ধারণা বদলাতে। আর জেসি ওয়েন্স তৈরি হয়েছিলেন দুনিয়ার কালো মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে যাবতীয় অন্যায়, অবিচারের জবাব দিতে। ছোটোবেলার একটি ঘটনা তখনও জেসিকে যন্ত্রণা দিত। বন্ধুদের সঙ্গে আমেরিকার এক রেস্তোরাঁয় খেতে ঢুকেছিলেন জেসি। শ্বেতকায় মালিক তখন খেয়াল করেননি। কর্মচারিরা গিয়ে খবর দিতেই মালিক এসে প্রায় ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছিলেন জেসিকে। জেসির অপরাধ, তাঁর গায়ের রং কালো। তিনি নিগ্রো! ওই রেস্তোরাঁয় কালো বা নিগ্রোদের প্রবেশ অধিকার ছিল না।

এরকম আরও অনেক ঘটনায় যেখানে কালো মানুষদের করা হত অপমান, অবহেলা। যেমন অনেক বাসেরই ভেতরে ঢোকার অধিকার ওখানে কালোদের ছিল না। কোনো কোনো বাসে জেসিদের যেতে হত বাসের পেছনে ঝুলে! আবার কোনো কোনো বাসে সামনের দরজা দিয়ে কালোরা উঠতে পারতেন না, উঠতে হত পেছনের দরজা দিয়ে। বসতে হত পেছন দিকে কালোদের জন্য জন্য নির্দিষ্ট আসনে!

বার্লিন অলিম্পিকে চারটে সোনার পদক জিতে মোক্ষম জবাব দিতে পেরেছিলেন জেসি ওয়েন্স। কিন্তু তাতেও কি বন্ধ হয়েছিল কালোদের ঘৃণা করা? ওই প্রসঙ্গে ঢোকার আগে একবার চোখ ফেলা যাক ছোটোবেলায় দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে জেসিদের লড়াইয়ে।

জেসি ওয়েন্সের জন্ম ১৯১৩ সালের ১২ সেপ্টেম্বর, আমেরিকার আলাবামার ড্যানভিলে এক দরিদ্র পরিবারে। বাবার নাম হেনরি ক্লিভল্যান্ড ওয়েন্স, মা এমা ফিডজেরাল্ড। জেসির বাবা ঢালাইয়ের কাজ জানতেন। কিন্তু সে কাজ বছরের সব সময় পাওয়া যেত না। ফলে মূলত তুলো ও শস্য চাষ করেই সংসার চালাতে হত। মাত্র ৭ বছর বয়সে জেসিকেও ওই তুলো চাষের কাজে হাত লাগাতে হয়। খুব কষ্টের মধ্যেই সংসার চলত। জেসির বয়স যখন ৯ বছর, অর্থাৎ ১৯২২ সালে সংসারে আরও দারিদ্র্য নেমে আসে। উইভিলস নামে একরকম পোকার আক্রমণে তুলো-সহ জমির সব ফসল নষ্ট হয়ে যায়। প্রায় না খেয়েই দিন কাটতে থাকে জেসিদের। বাধ্য হয়েই জমি বিক্রি করে জেসির বাবা ক্লিভল্যান্ডে চলে যান। সঙ্গে নিয়ে যান জেসির বড়দা প্রেনটিসকে। ক্লিভল্যান্ডে থাকতেন জেসির দিদি লীলা মে। তাঁর সহায়তায় হেনরি এবং প্রেনটিস পেট চালানোর মতো কিছু কাজ পেয়ে যান। মাস তিনেক পর জেসিদের পরিবারের বাকিরাও ক্লিভল্যান্ডে চলে আসেন।

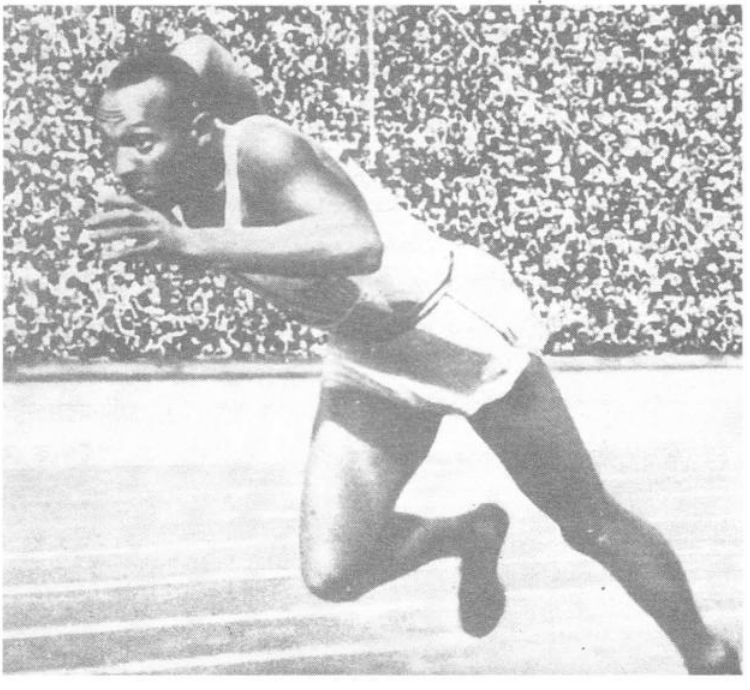

বার্লিন অলিম্পিকের চারটি সোনার মালিক যে-নামে সারা বিশ্বে পরিচিত সেই 'জেসি' নামটি কিন্তু তাঁর বাড়ির কারও দেওয়া নয়। হঠাৎই পাওয়া। জেসির আসল নাম জেমস ক্লিভল্যান্ড ওয়েন্স। ক্লিভল্যান্ডে আসার পর জেসিকে ভর্তি করা হয় সেন্ট ক্লেয়ার স্কুলে। ভর্তির সময় ওই স্কুলের এক শিক্ষিকা নাম জিজ্ঞেস করলে সংক্ষেপে 'জে সি ওয়েন্স' বলেন। খুব তাড়াতাড়ি বলায় শিক্ষিকা ভুল বুঝে স্কুলের খাতায় 'Jesse Owens' লিখে নেন। সেই থেকে তিনি জেসি ওয়েন্স। 'লাইফ অ্যাজ এ ব্ল্যাক ম্যান'-এ এসব কথা যখন লিখেছেন তখন আর জেসি ওয়েন্সের মনে ছিল না ওই শিক্ষিকার নাম।

জেসি ছিলেন বাবা-মার দশটি সন্তানের একেবারে ছোটোটি। শিশুবয়স থেকেই ব্রঙ্কাইটিসে আক্রান্ত। ড্যানভিলে থাকার সময় একাধিকবার জীবন বিপন্ন হয়ে গিয়েছিল। কোনোরকমে প্রাণে বেঁচেছেন।

ক্লিভল্যান্ডে আসার পর দারিদ্র্য বিশেষ না কাটলেও, জেসি এমন একজন মানুষের দেখা পেয়ে যান যিনি বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখিয়ে দেন। তিনি চার্লস রিলে। লোকে ডাকতেন চার্লি রিলে বলে। আইরিশ এই ভদ্রলোক ফেয়ারমাউন্ট জুনিয়র হাইস্কুলের অঙ্কের শিক্ষক ছিলেন। পার্টটাইম অ্যাথলেটিক কোচও। জেসি তখন সেন্ট ক্লেয়ার প্রাথমিক স্কুল ছেড়ে বোল্টন জুনিয়র হাইস্কুলে চলে এসেছেন। বোল্টন এবং ফেয়ার মাউন্ট স্কুল ছিল পাশাপাশি। ওদের খেলা মাঠও ছিল পাশাপাশি। দুই স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে নানারকম খেলার প্রতিযোগিতাও হত নিয়মিত। ওখানেই চার্লি প্রথম দেখেন জেসিকে। সেই প্রথম দেখাতেই চার্লির মনে হয়েছিল ছেলেটার মধ্যে ভালো মশলা আছে। তিনি জেসিকে প্রস্তাব দিলেন, কোচিং করাবেন। কিন্তু জেসির সময় কোথায়? লেখাপড়ার বাইরে সংসারের কষ্ট দূর করতে তাঁকে নানারকম কাজও করতে হয়! আর্থিক সমস্যা কিছুটা মিটিয়ে দিয়ে চার্লি প্রতিদিন স্কুল শুরুর আগে একঘণ্টা করে প্রশিক্ষণ দিতে লাগলেন জেসিকে। ততদিনে চার্লির আকর্ষণে জেসি বোল্টন ছেড়ে ফেয়ারমাউন্ট স্কুলে ভর্তি হয়ে গিয়েছেন। তখন ওখানে বিভিন্ন জুনিয়র হাইস্কুলের মধ্যে অনেক প্রতিযোগিতা হতো। তা থেকে প্রচুর পদক জিততে শুরু করলেন জেসি। আস্তে আস্তে বড়ো হওয়ার স্বপ্ন দেখা শুরু হলেও, তখনও অলিম্পিক পদক জয়ের ব্যাপারটা মাথায় ঢোকেনি। সেটা ঢুকল ১৫ বছর বয়সে, ১৯২৮ সালে। এর পেছনেও রয়েছে একটি ঘটনা।

১৯২০ সালে অ্যান্টোয়ার্প অলিম্পিকে ১০০ মিটার দৌড়ে সোনা জিতেছিলেন আমেরিকার চার্লি প্যাডক। ১৯২৮ সালে তিনি বেরিয়েছিলেন চ্যারিটি সফরে। নানা জায়গায় ভাষণ দিতেন অ্যাথলেটিক্স নিয়ে। জেসিদের ক্লিভল্যান্ডেও এসেছিলেন চার্লি প্যাডক। তাঁর ভাষণে উদ্বুদ্ধ হন জেসি। অলিম্পিকের স্বপ্ন দেখা শুরু তখন থেকেই। সেটা কি সোনার স্বপ্ন ছিল না? জেসি ওয়েন্স পরে লিখেছেন : 'চার্লি রিলের কাছে কোচিং শুরু করার পরই অলিম্পিকে একদিন অংশ নেব, এমন স্বপ্ন দেখা শুরু হয়। আর চার্লি প্যাডকের ভাষণ আমাকে এতই উদ্বুদ্ধ করে যায় যে, তখন মনে হয় একটি পদকও জিততে হবে। তবে তখন সোনা, রুপো বা ব্রোঞ্জ নিয়ে ভাবিনি। স্রেফ একটি অলিম্পিক পদক। অলিম্পিকে ১০০ মিটার দৌড়ের সোনা জয়, যে-কোনও মানুষের কাছেই সবচেয়ে গর্বের ব্যাপার। বার্লিনে ১০০ মিটারে সোনা জিতে বিশ্বের দ্রুততম মানুষ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আমিও গর্বিত হয়েছিলাম। সেবার অবশ্য আরও তিনটি সোনাও জিতেছিলাম। এতটা সত্যি আশা করিনি।'

বার্লিন অলিম্পিকে তিনি সোনা জিতেছিলেন ১০০ মিটার (১০.৩ সেকেন্ড), ২০০ মিটার (২০.৭ সেকেন্ড), লং জাম্প (২৬ ফুট সাড়ে ৫ ইঞ্চি) ও ৪ × ১০০ মিটার রিলে (৩৯.৮ সেকেন্ড)। চারটিই ছিল অলিম্পিক রেকর্ড। রিলেতে বিশ্বরেকর্ডও।

বার্লিন অলিম্পিক তো জেসি ওয়েন্সের জীবনে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেই, কিন্তু শুধু যদি একটি দিন হিসাবে দেখা হয়? তাহলে ওয়েন্সের জীবনের স্মরণীয় দিনটি হল ২৫ মে, ১৯৩৫। বিশ্বের খেলাধুলোর ইতিহাসেও ওই দিনটি স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। ওই দিন মিচিগানের আন আরবার ওহিও স্টেট ইউনিভার্সিটির হয়ে বিগ টেন চ্যাম্পিয়নশিপে মাত্র ৪৫ মিনিটে জেসি ওয়েন্স তিনটি বিশ্বরেকর্ড ভেঙেছিলেন এবং একটি বিশ্বরেকর্ড ছুঁয়েছিলেন। যার মধ্যে একটি বিশ্বরেকর্ড ছিল লং জাম্পের। তিনি লাফিয়েছিলেন ২৬ ফুট সোয়া আট ইঞ্চি (৮.১৩ মিটার)। জেসির ওই রেকর্ড অক্ষত ছিল ২৫ বছর ৭৯ দিন। ১৯৬০ সালের ১২ অগাস্ট আমেরিকারই রালফ বোস্টন ৮.২১ মিটার লাফিয়ে জেসির ওই রেকর্ড ভেঙেছিলেন। বাকি দুটি বিশ্বরেকর্ড গড়েছিলেন ২২০ গজ দৌড় (২০.৩ সেকেন্ড), ২২০ গজ হার্ডলস (২২.৬ সেকেন্ড)। আর বিশ্বরেকর্ড ছুঁয়েছিলেন ১০০ গজ দৌড়ে (৯.৪ সেকেন্ড)।

জেসি ওয়েন্স যখন ট্রাকে এমন কাণ্ড করেন, তাঁর

বাবা তখন বেকার। প্রায় ২ বছর কোনও কাজ নেই। ৪৫ মিনিটের ওই চারটি বিশ্বরেকর্ডের পর জেসি ঘোষণা করেন, তাঁর বাবাকে কোনও কাজ দেওয়া না হলে তিনি আর দৌড়বেন না। এই হুমকিতে কাজ হয়। প্রতিদিন তাঁর বাবার কাছে আসতে থাকে চাকরির অসংখ্য নিয়োগপত্র। শেষপর্যন্ত তা থেকে একটি বেছে নেন জেসির বাবা।

১৯৩৫ সালের ওই অভাবনীয় সাফল্যের আগেই অবশ্য কোচ বদল হয় জেসির। না, জেসি ওয়েন্স নিজে চার্লি রিলেকে ছেড়ে আসেননি। ১৯৩৪ সালে চার্লি রিলে নিজেই মনে করেছিলেন, বার্লিন অলিম্পিকে সাফল্যের জন্য জেসি ওয়েন্সের প্রয়োজন একজন তরুণ কোচ। চার্লি নিজেই জেসিকে নিয়ে গিয়ে ওহিও স্টেটের তরুণ কোচ ল্যারি স্নাইডারের হাতে জেসিকে তুলে দিয়েছিলেন। চার্লির এই সিদ্ধান্ত যে নির্ভুল ছিল, জেসি ওয়েন্স তা প্রমাণ করেছিলেন বার্লিন অলিম্পিকে। কিন্তু কী পেয়েছিলেন জেসি? বলা যায়, দুনিয়ার মানুষের ভালোবাসার পাশাপাশি কারো কারো উপেক্ষা, ঘৃণাও।

বার্লিন অলিম্পিকের মূল স্টেডিয়ামে আসতেন অ্যাডলফ হিটলার। তাঁর জন্য নির্দিষ্ট আসনে বসতেন। সোনাজয়ীদের সঙ্গে হাত মেলাতেন, কথা বলতেন, অভিনন্দন জানাতেন। কিন্তু নিগ্রো জেসি ওয়েন্সের সাফল্য তিনি মেনে নিতে পারেননি। জেসি প্রথম সোনাটি গলায় তুলেছিলেন ১০০ মিটার থেকে। জেসির সঙ্গে হাত মেলাতে রাজি হননি হিটলার। পরের দিন দ্বিতীয় সোনাটি আসে লং জাম্প থেকে। এবারও একই ভূমিকা হিটলারের। তিনি জেসির সঙ্গে হাত মেলাননি। একদিন পর ২০০ মিটারে জেসি যখন তৃতীয় সোনাটি জেতেন, রাগে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন হিটলার। শুধু তাই নয়, তিনি আর স্টেডিয়ামেই থাকেননি। রেগে বেরিয়ে যান।

অ্যাডলফ হিটলারের কাছ থেকে এরকম খারাপ ব্যবহার পেলেও ওই বার্লিনেই জেসি পেয়েছিলেন এক ভালো বন্ধুকেও। তিনি হিটলারের দেশেরই লোক। নাম লুৎজ লঙ। তিনি জার্মানির বিখ্যাত লং জাম্পার। বার্লিন অলিম্পিকে লং জাম্পে ছিলেন জেসি ওয়েন্সের সবচেয়ে বড়ো প্রতিদ্বন্দ্বী। একে অপরকে আগে চিনতেন না। যোগ্যতা অর্জনের লাফ চলছে। ওয়ার্মআপ করছিলেন জেসি। তখনও গায়ে সোয়েটার। স্টেপিং ঠিক করার জন্য একবার দৌড়ে এসে দাঁড়ালেন পিটের সামনে। লাল পতাকা উঠে গেল! জেসির প্রথম জাম্পের চেষ্টা হিসেবে ওটা ধরা হল এবং তা 'ফাউল'। বিস্মিত জেসি ওয়েন্স! হয়তো ওই বিস্ময়ের ঘোরেই দ্বিতীয় জাম্প বাকি! যোগ্যতামান পেরোতে না পারলে বিশ্বরেকর্ডের মালিক পৌঁছতেই পারবেন না ফাইনালে। এমন সময় এগিয়ে এলেন লঙ। ওয়েন্সকে বললেন : 'মাথা ঠান্ডা রাখো। তোমার বিশ্বরেকর্ড তো ২৬ ফুটেরও বেশি। এখানে যোগ্যতা মান তো মাত্র ২৩ ফুট সাড়ে ৫ ইঞ্চি। তুমি টেকঅফ বোর্ডের কয়েক ইঞ্চি আগে একটা মার্ক করে নাও। ওখান থেকে টেক অফ করো।' এই বলে তিনি নিজের রুমাল এগিয়ে দিলেন ওয়েন্সের হাতে। মার্ক করার জন্য। তৃতীয় জাম্পে সহজেই যোগ্যতামান পেরিয়ে ফাইনালে পৌঁছে গেলেন জেসি। পরে সোনাও জিতলেন। আর রুপো পেলেন লুৎজ লঙ। সোনার পদক দেখিয়ে লাজ লঙকে জেসি বলেছিলেন : 'নিয়ে নিতে পার। এটা তো আসলে তোমারই প্রাপ্য।' সেই থেকেই জেসি ওয়েন্সের ভালো বন্ধু হয়ে যান লুৎজ লঙ। মাত্র ৭ বছর হয়েছিল ওঁদের বন্ধুত্বের বয়স। ১৯৪৩ সালের ১৪ জুলাই যুদ্ধে মারা যান লঙ। তারপরও অবশ্য জেসি নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন লুৎজের পরিবারের সঙ্গে। ১৯৮০ সালের ৩১ মার্চ ফুসফুসের ক্যান্সারে মারা যাওয়ার আগে পর্যন্ত জেসি ওটা বজায় রেখেছিলেন।

বার্লিন অলিম্পিকে চার-চারটি সোনা জেতার পরও নাৎসি সংগঠকরা যোগ্য সম্মান দেননি জেসি ওয়েন্সকে। কিন্তু আমেরিকায় ফিরে তিনি কতটা সম্মান পেয়েছিলেন? থাকার কথা, তাই সাধারণ মানুষের উচ্ছ্বাস তাঁকে নিয়ে ছিলই। জেসি লিখেছেন : 'একদিন যে-রেস্তোরাঁর মালিক আমাকে প্রায় ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছিলেন, তিনি আমার সম্মানে ওই রেস্তোরাঁয় পার্টি দিয়েছিলেন।' এরকম কিছু পরিবর্তন হয়েছিল। পাশাপাশি এটাও ঘটনা, রাষ্ট্রনেতাদের কাছে কালো চামড়ার জেসি ওয়েন্স উপেক্ষিতই ছিলেন। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট একটি অভিনন্দন বার্তাও পাঠাননি জেসি ওয়েন্সকে। জোটেনি জেসির কোনও চাকরিও। অতঃপর তিনি অর্থ উপার্জনের জন্য নানা পথ বেছে নেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যবসা করেন। আর ঠিক বার্লিন অলিম্পিকের পর তিনি রোজগারের একটা ভালো পথ বেছে নিয়েছিলেন। বাজি ধরে দৌড়তেন ঘোড়ার সঙ্গে। জিততেন প্রতিবারই। আয় হত প্রচুর। আসলে মানুষ-ঘোড়ার ওই দৌড়ে তিনি দর্শকদের বোকা বানাতেন!

অন্যদিনের গল্প

আত্রেয়ী ভট্টাচার্য

গ্রাহক সংখ্যা : ২১০৯, বয়স : ১৬ বছর

স্কুলবাসের শেষ সীটটার এক কোনায় একা একা বসে ছিল টুপ। থেকে থেকেই ওর বুকটা ভয়ে কেঁপে উঠছিল। বাসে অন্য মেয়েরা তখন নিজেদের মধ্যে গল্প করছে, হাসছে। একমাস আগে হলে টুপও ওদের সঙ্গেই থাকত। কিন্তু এখন ও জানে, ওদের মধ্যে একজনও আসলে মানুষ নয়, ওরা মানুষের ছদ্মবেশ ধরে আছে। ওরা আসলে...। কথাটা ভাবতেই টুপ আবারও ভয়ে শিউরে উঠল।

বাসটা ততক্ষণে কাঁকুড়গাছি বাসস্ট্যান্ডে এসে দাঁড়িয়েছে, এখান থেকে ঐন্দ্রিলা উঠবে। ঐন্দ্রিলা টুপের বন্ধু, ওর সঙ্গে একই সেকশনে পড়ে। ঐন্দ্রিলাও তবে...? টুপ আর ভাবতে পারল না। বাস আবার চলতে শুরু করেছে। টুপের সামনের সিটে রূপসার পাশে ঐন্দ্রিলা এসে বসল। টুপ শুনতে পেল রূপসা ঐন্দ্রিলাকে জিজ্ঞাসা করছে রূপসা যে নোটটা চেয়েছিল ঐন্দ্রিলা সেটা এনেছে কিনা। ঐন্দ্রিলা বলল, 'কোথাও খুঁজে পেলাম না রে। আজকে না-হয় বাড়ি গিয়ে আরেকবার দেখব।' আর কিছু টুপ শুনতে পেল না। ওর বুকের মধ্যেটা কেউ যেন চেপে ধরছে। টুপ প্রাণ খুলে শ্বাস নিতে পারছে না। ঐন্দ্রিলার মুখটা ওর চোখের সামনে অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে... সেই বিকট ভয়ংকর মুখগুলোর মতো।

ঘটনাটা ঘটেছিল প্রায় একমাস আগের এক মাঝরাতে। টুপ একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছিল— ওকে কারা যেন বন্দি করে রেখেছে। অন্য কোনো মানুষকেই ও দেখতে পাচ্ছে না। তারপর একদল ভয়ংকর জীব ওর দিকে এগিয়ে এল। তারা ওকে বলল, পৃথিবীর কোনো মানুষই আর মানুষ নেই। সবাইকে ওরা নিজেদের মতো বিকট ভয়ংকর জীবে রূপান্তরিত করেছে। বাকি আছে শুধু টুপ। টুপ স্বপ্নের মধ্যেই শিউরে উঠেছিল। তারপর ওদের মধ্যে একজন টুপকে সেই ভয়ংকর কথাটা বলেছিল, 'আমরা এখন তোমাকেও আমাদের মতন জীবে পরিণত করব আর তারপর এই পৃথিবী জুড়ে রাজত্ব করব। কিন্তু তার জন্য প্রথমে তোমাকে বলতে হবে তুমি আর মানুষ থাকতে চাও, নাকি, ঠিক আমাদেরই মতো হয়ে যেতে চাও। তাহলেই দেখবে তুমি সেইরকমই হয়ে গেছ। অন্যের জন্য ভাবনায় মানুষের জীবনের কত অমূল্য সময় নষ্ট হয় জান? কিন্তু আমাদের মতো হলে সেসব আর কিচ্ছু থাকবে না। তাতে তোমার মঙ্গলই হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি তুমি মানুষই থাকতে চাও, তাহলে সবসময় এক ভীষণ রকমের ভয় তোমাকে ঘিরে ফেলবে। তোমাকে বলতেই

হবে তুমি আমাদের মতো হতে চাও।' একটা অজানা আতঙ্ক টুপকে যেন গ্রাস করতে লাগল। ও চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'না।'

সঙ্গে সঙ্গেই ওর ঘুম ভেঙে গেল। জেগে উঠেও ও হাঁফাচ্ছিল আর ঘামে ওর সারা শরীর ভিজে গিয়েছিল। তারপর থেকে ওর সবাইকেই মানুষের ছদ্মবেশ ধরা ওই ভয়ংকর জীবগুলো বলে মনে হচ্ছে, এমনকী ওর মা-বাবাকেও। স্বপ্নটা দেখার পরদিন সকাল থেকেই টুপ এটা প্রথম লক্ষ্য করে। সামনেই টুপের হাফইয়ার্লি পরীক্ষা আর তারপরই পুজোর ছুটি। পুরো একমাস। এই সময়টা টুপের আর ঘরে থাকতে ইচ্ছে করে না। শরতের উদাস মেঘের সঙ্গে ও-ও ভেসে চলতে যায়, ইচ্ছে করে অনেক দূর দেশে ঘুরে আসতে। তাই, এই ছুটিটায় প্রতিবছরই ওরা বেড়াতে যায়। এবারও ঠিক ছিল একাদশীর দিন ওরা পুরীর ট্রেন ধরবে। পুরীতে টুপ আগেও গেছে। তবে, আবার যাবার নাম শুনে ওর মনটা নেচে উঠেছিল। সমুদ্র টুপের খুব ভালো লাগে। কিন্তু সেদিন সকালবেলায় যখন টুপের বাবা বললেন, 'এবার আর না গেলেও চলে। আমার ছুটি পাওয়া মুশকিল। তাছাড়া যেতে গেলে তো খরচও আছে। জিনিসপত্রের দাম যেভাবে বাড়ছে!' মা-ও চুপ থেকে সম্মতিই জানালেন। জেগে উঠে, রাতের সেই ভয়টাকে টুপ প্রথম অনুভব করল। এমনিতে যে টুপ মা-বাবার কথা শোনে না, তাঁদের সুবিধে-অসুবিধে বোঝে না, তা নয়। কিন্তু সেদিন বাবা কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে ও দেখল বাবা আর মা-র মুখটা কেমন অদ্ভুতভাবে পালটে যাচ্ছে। ভয়ে টুপ চোখ বন্ধ করে নিয়েছিল।

এরপর থেকেই আস্তে আস্তে টুপ বুঝতে পেরেছিল ওর চারপাশে সবাই সেই ভয়ংকরদর্শন জীব, আর ওর এই ভয়ের হাত থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হল ঠিক ওদেরই মতো হয়ে যাওয়া। কিন্তু তাহলে ও আর কোনোদিন মানুষ হতে পারবে না। ভাবতেই মুহূর্তে টুপের বুকের ভিতরটা ভয়শূন্য হয়ে যায় আর সেই ফাঁকা জায়গাটা এক অদ্ভুত, না-বোঝা দুঃখ আর কান্নায় ভরে ওঠে। এই কদিনের মধ্যে সেটা ব্যতিক্রম, কারণ ভয় ছাড়া আর অন্য কোনো অনুভূতিই ও প্রায় ভুলতে বসেছে।

এখন টুপের হাফ-ইয়ার্লি চলছে। পরীক্ষা শেষ হতে আর দুদিন বাকি। আজ অঙ্ক আর কাল একটা ছোট্ট মৌখিক পরীক্ষা। বলতে গেলে, আজ হলেই প্রায় শেষ। অন্যবার হলে অন্য সকলের মতো এইসময় টুপেরও খুব আনন্দ হয়। কিন্তু, প্রায় একমাস আগের স্বপ্নটার জন্য পরীক্ষা শেষের আনন্দ আর পরীক্ষা চলার উত্তেজনা কোনোটাই টুপ বুঝতে পারছে না। কথাটা ভাবতেই টুপের মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেল আর ওর ভীষণ ক্লান্ত বোধ হতে লাগল। কিন্তু দুঃখ একটুও হল না। চোখে একফোঁটা জলও এল না। যন্ত্রের মতো গিয়ে ও খাবার টেবিলে বসল। বাবাও ওর সঙ্গেই অফিসে বেরোবেন। ওর পাশের চেয়ারটা টেনে বসে বাবা বললেন, 'টুপ, কালকে তো তুই তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছিলি, তাই কথাটা আর বলা হয়নি। আমরা পুরী যাচ্ছি। ছুটিটা পেতে অসুবিধে হয়েছিল ঠিকই। অফিস থেকে বলল, এসময় ছুটি নিয়ে দূরে ট্রান্সফার করে দিতে পারে। তা দিলে আর কী করা যাবে বল? তাই বলে তোর পরীক্ষা শেষ হবে আর বেড়াতে যাব না— সেটা কি হয়!' বাবার হাসিভরা মুখ থেকে চোখ সরিয়ে মা-র দিকে তাকাল টুপ। মা টুপের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসছেন। টুপের বুকটা কেঁপে উঠল। ও জানে সেটা ভয়ে নয়, তবে আনন্দে কী? টুপ বুঝতে পারল না। টুপ ঠোঁটদুটো দিয়ে হাসতে চেষ্টা করল। তাতে প্রাণ হয়তো এল না। কিন্তু বুকের কম্পনটুকু টুপের অদ্ভুত হাসিটার সঙ্গে মিশে গেল।

স্কুলবাসে বসে থাকতে থাকতে আবার ভয় করছিল টুপের। কিন্তু অন্যদিনের মতো নয়। আজকে অন্যদিকের চেয়ে অনেক হালকা লাগছে ওর। টুপ লাল আলোটার দিকে তাকিয়ে ছিল। সেই জীবগুলোর চোখ ঠিক এইরকম ছিল। ও ভয়ে শিউরে ওঠার আগেই আলোটা সবুজ হয়ে গেছে। বাসটা এগিয়ে চলল। ঐন্দ্রিলা ততক্ষণে বাসে উঠেছে। ব্যাগ থেকে একটা খাতা বের করে রূপসার হাতে দিতে দিতে ঐন্দ্রিলা বলল, 'দুদিন ধরে খুঁজেও খাতাটা পাচ্ছিলাম না। কাল সন্ধেবেলা দেখি ভাইয়ের খেলার বাক্সে খাতাটা পড়ে আছে। যাইহোক, কালকের পরীক্ষার জন্য তো। দেখবি, ওরাল পরীক্ষার ছোট ছোট প্রশ্ন-উত্তরগুলো সব লেখা আছে।' টুপ যেন একটা ঝাপসা মানুষের মুখ দেখতে পেল।

পরীক্ষা শেষের ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে অন্য সকলের সঙ্গে টুপ বাইরে বেরোল। পরীক্ষা টুপ ভালোই দিয়েছে। কালকের পরীক্ষার জন্য আর কেউই তত চিন্তিত নয়। তাই এখন ফুচকার সামনে লম্বা লাইন পড়ে গেছে, আইসক্রিমওয়ালা ভিড় সামলাতে হিমসিম খাচ্ছে। টুপ সেদিকে দেখল না। ও তখন ঝরনাকে খুঁজছিল, অনেকদিন দেখেনি ও ঝরনাকে। ঝরনা একটা ভিখারি মেয়ে, ওর চোখদুটো অন্ধ, টুপের থেকে বছর তিন-চারের ছোট ও। ঝরনা টুপের বন্ধু। টুপ প্রায়ই ওর টিফিন থেকে দুটো পাঁউরুটি কি একটা কলা ঝরনার জন্য রেখে দেয়। রোজ ছুটির পর ও ঝরনার সঙ্গে গল্প করে। কিন্তু আজ একমাসের কাছাকাছি হতে চলল টুপ ঝরনাকে দেখেনি।

হঠাৎ টুপের মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত সন্দেহ জেগে উঠতে লাগল, ঝরনা সত্যিই অন্ধ তো? নাকি... টুপকে যেন আবার সেই বিকট ভয়ংকর জীবগুলো ঘিরে ফেলছে আর ওর কানের কাছে চিৎকার করে বলছে, 'বলো, তুমি আমাদের মতো হয়ে যেতে চাও।' টুপের মাথা ঘুরছে। চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে। কতক্ষণ ও এরকমভাবে ছিল জানে না। হঠাৎ একটা পরিচিত ডাক শুনে চোখ মেলে তাকাল। 'দিদি, দ্যাখো, আমার চোখ ভালো হয়ে গেছে।' টুপ কিছু বুঝতে পারল না। ঝরনা ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে আর দু'চোখ মেলে ওকে দেখছে। 'জানো, আমাদের ওখানে তোমার মতন আরেকটা দিদি থাকে। আমায় খুব ভালোবাসে। দিদিটার দাদু মারা গেল আর আমায় চোখদুটো দিয়ে গেল। এখন আমি সব দেখতে পাচ্ছি। চারদিকটা কত সুন্দর না?'

টুপ তাকিয়ে দেখল। সত্যিই এই পৃথিবীটা বড় সুন্দর! টুপ আকাশের দিকে চোখ মেলল। শহরতের নীল আকাশে সাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে আর যেন ওরই দিকে চেয়ে হাসছে। টুপের মনটা নেচে উঠল। টুপ জানে এরই নাম আনন্দ। আর এত আনন্দ ও জীবনে কখনও পায়নি। টুপ স্কুলবাসের দিকে পা বাড়াল। এগিয়ে চলল এক আলোয় ভরা আর মানুষে ভরা পৃথিবীর মধ্যে দিয়ে।

সাগ্নিক কুমার সেন

গ্রাহক সংখ্যা : ৪৭০, বয়স : ৭ বছর

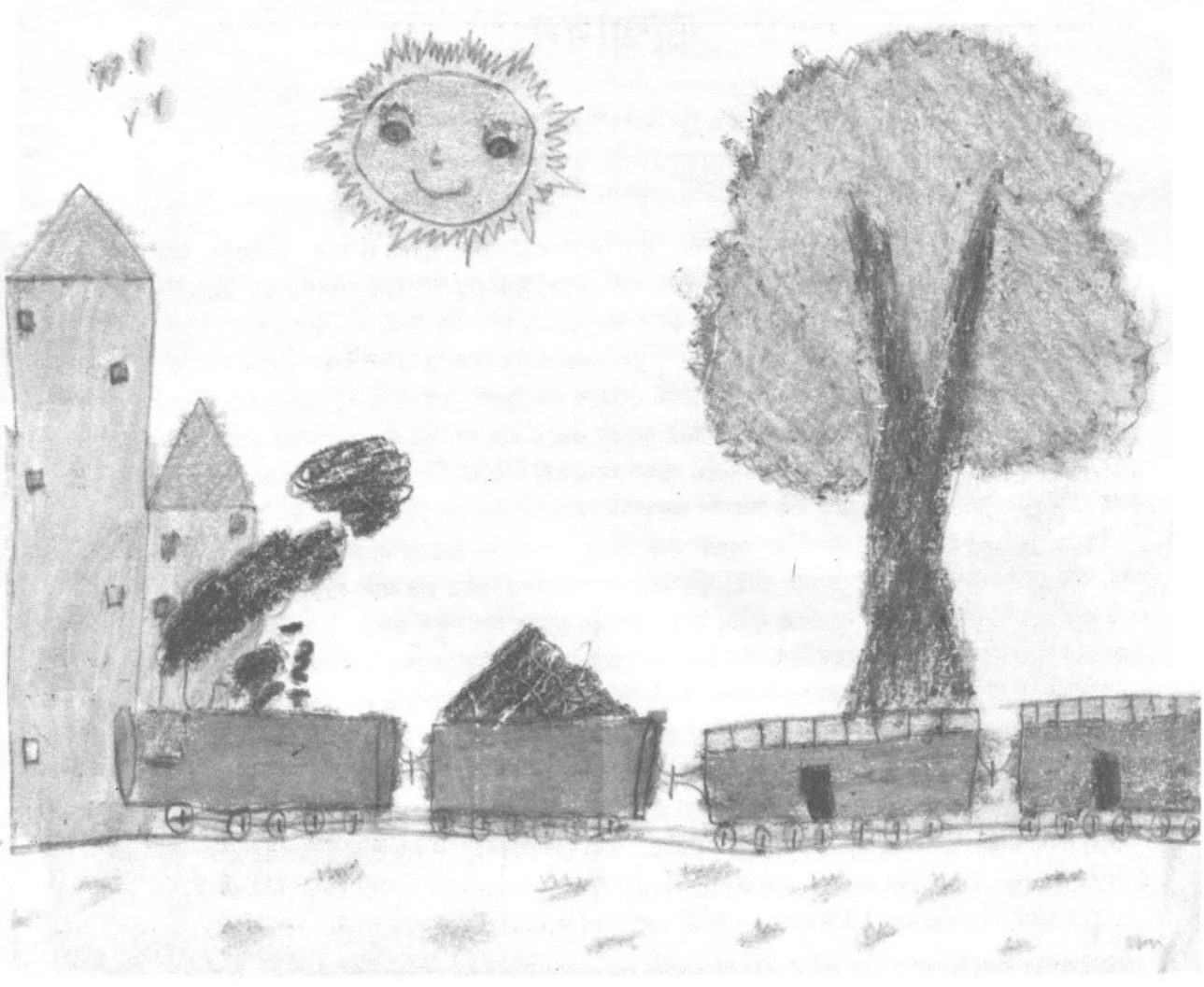

ভূতের বিয়ে

সুশ্রুত চক্রবর্তী

গ্রাহক সংখ্যা : ৪০২৮, বয়স : ৯ বছর

কেওড়াতলায় ভূতের পাড়ায়
হচ্ছে যে শোরগোল,
হাড়গিলে ভূত কাঁসর বাজায়,
লুল্লু বাজায় ঢোল।
বিয়ের কনে শাঁকচুন্নি,
ঘটক একানোড়ে,
করতে বিয়ে আসছে গোভূত
শিং দুটি তার নেড়ে।

মামদোমশাই কন্যাকর্তা,
পুরুত ব্রহ্মদত্যি,
ডাইনিবুড়ির রান্না খেয়ে
সব্বার পেট ভর্তি।
বিয়ের শেষে শাঁকচুন্নি
চলল শ্বশুরঘর
শ্বশুরবাড়ি আপন এখন,
বাপের বাড়ি পর।

জন্মদিন

পুলস্ত্য পারেখ

গ্রাহক সংখ্যা : ৯৯৭, বয়স : ১২ বছর

পুলু আজ খুব উত্তেজিত। আজ তার জন্মদিন। স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে খুব মজা হবে, খুব ভালো পার্টি হবে। খুব আনন্দ পুলুর। ঘুম থেকে উঠেই যত্ন করে দাঁত মেজে, মুখ ধুয়ে নিল। তারপর নিজেই বিছানাটা চটপট গুছিয়ে নিল। অন্যদিন সে বিছানা কিছুতেই তুলত না, কিন্তু আজকে সব ঠিকঠাক হওয়া চাই।

খেতে বসে পুলু পাঁউরুটি খেতে খেতে তার বাবাকে জিজ্ঞেস করল, 'আজ ছোটোকাকা আসবে কি?' বাবা অবাক হয়ে বলল, 'আজ আবার কীজন্যে আসবে?' পুলু ভাবল বোধহয় বাবা ভুলে গেছেন। বলল, 'বাঃ! আমার জন্মদিন না?' পুলুর দাদা বিরক্ত হয়ে বলল, 'চটপট খেয়ে নে। আর বকবক করতে হবে না। তুই নিশ্চয় কোনো স্বপ্নটপ্ন দেখেছিলি।' পুলুর মন খারাপ হয়ে গেল। পুলু বারবার বোঝাতে লাগল আজ তার জন্মদিন কিন্তু তার মা, বাবা আর দাদা এমন ভাব করল যেন আজ অন্যান্য দিনের মত এক সাধারণ দিন।

ইস্কুলে পুলু ভেবেছিল সুনীল বা গৌতম তাকে কার্ড দেবেই, আর কেউ দিক বা না-দিক। কিন্তু কার্ড দেওয়া দূরের কথা, তার যে জন্মদিন তা-ই তাদের মনে নেই। পুলু ভর্তি হয়েছিল বারো বছর চার মাস বয়সে, তাই তার ক্লাসে বেশি কেউ তার জন্মদিনের কথা জানে না। কিন্তু সুনীল আর গৌতমের জানার কথা। পুলু ভাবল সে তারিখ ভুল করেনি তো? একজনকে জিজ্ঞেস করে সে মিলিয়েও নিল। হ্যাঁ, ঠিক দিন। তবে কেন সবাই ভুলে গেছে? কেমন যেন একা একা লাগল।

বাড়ি ফিরে আসার সময়ে গৌতমকে জিজ্ঞেস করল, 'তুই ওই দিকে কোথায় যাচ্ছিস? তোর বাড়ি তো এদিকে।'

'এদিকে দোকানে যাচ্ছি। আর তুই আজকে তোর জন্মদিন বলছিলি কেন রে? তোর জন্মদিন তো দোসরা জানুয়ারি,' জানাল গৌতম।

'আমার জন্মদিন আমার চেয়ে ভালো কে জানে?' প্রশ্ন করে পুলু। কিন্তু ততক্ষণে গৌতম দ্রুত বেগে এগিয়ে গেছে।

পুলু যখন বাড়ি পৌঁছাল তখন হল-ঘরে তার সব আত্মীয় এবং গৌতম ও সুনীল সব বসে আছে আর একটা বড় কেক-এ লেখা 'Happy Birthday and Happy April Fool's Day to Pulu!!'

পুলুর মনেই ছিল না, পয়লা এপ্রিল তার জন্মদিন এবং বিশ্ব পরিহাস দিবস!

শারদীয়া সংখ্যায় সুশ্রুত চক্রবর্তীর 'বৃষ্টি সংবাদ' কবিতাটা প্রকাশিত হয়ে গেছে সৌমিক সরকারের নামে। কী কাণ্ড! ভুল অবিশ্যি আমাদেরই।

তিতলি-ফুলের খোঁজে

জীবন সর্দার

তিতলি কোনো ফুল নয়। তিতলি মানে প্রজাপতি, হিন্দি-ভাষায়। অথচ ছোট্ট সুন্দর হাসিখুশি পাহাড়ি মেয়েটা, একগুচ্ছ পাহাড়িয়া ফুলকে দেখিয়ে বলল, 'ওটা তিতলি-ফুল'। প্রজাপতির ডানার রঙের বাহার ছিল ওই ফুলের পাপড়িতে।

প্রকৃতি-পড়ুয়ার যেমন স্বভাব— প্রকৃতির রূপগুণের রহস্যর খোঁজে সবখানে হাজির হওয়া, আমিও তেমনই হিমালয়ের পথে, বনের ধারে বিশেষ বিশেষ ফুলের নমুনা দেখছিলাম। পশ্চিম-সিকিমের ওই ফুলটি দেখে মন কেমন করে উঠেছিল। হাওয়ায় চারটি ডানা ছড়িয়ে মেলে দিয়ে যেন উড়ে যাবার ভঙ্গি ছিল ফুলগুলির। পাপড়িগুলোর ডগা গাঢ় গোলাপি কিন্তু গোড়ায় সে রঙ ফ্যাকাসে। পদ্ম-ফুলের পাপড়ির মতো গড়ন এই নাম না-জানা ফুলটির, বা ফুলগুলির। কী নামে চিনব তাকে, কিংবা চেনাব শক্তিকে, সে কথা ভাবতেই ওই ছোট্ট মেয়েটি বলল ওটার নাম তিত্‌লি। ওর কথা মানতে পারব কিনা জানি না। কিন্তু ভাবতে ভালো লেগেছে। অবশ্য আমি বুঝে গিয়েছিলাম ওটা একজাতীয় **'অর্কিড'**।

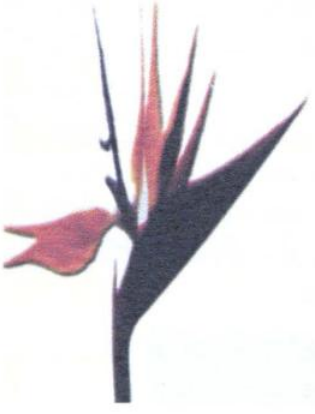

অর্কিড শব্দটি বাংলা ভাষায় চালু হয়ে গিয়েছে। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীর ভাষায় ওগুলো একবীজপত্রী গাছের দল। যারা বিবর্তনের সিঁড়ির অনেক উঁচু ধাপে উঠে এসেছে। আজ এখন যদি ওই 'ফুলের-দলের' একটি নমুনা তোমাদের কাছে হাজির করে দেখাতে পারতুম, তবে সহজেই বুঝে যেতে অর্কিডের, অর্কিড ফুলের রঙ-গড়ন কেন অমন।

পরাগ মেলাবার জন্য পোকাদের কাছে টানা খুব প্রয়োজন। আর সেই কাজে ফুলের রঙ-গড়ন আর মধু খুব দরকার। পোকা মানে যে কোনো পোকা নয়, মাছি-জাতীয় পোকা। যে পোকা উড়ে এসে বসতে পারে। শুধু বনে থাকা নয়, হেঁটে ফুলের বুকের পরাগ বা মধুর কাছে পৌঁছে যাওয়া চাই। এ কাজটা মাছিরাই ভালো পারে। আরও দেখে দেখে বুঝেছি, মাছিরা যাতে এসে বসতে পারে, বসার সুবিধে হয় তাদের, তাই সব অর্কিড ফুলের একটা না একটা পাপড়ি পাতা থাকে— যেন ফুলের কাঁধ সেটা। 'এসো বস আহারে'— নিমন্ত্রণ স্পষ্ট।

ফুলের কাছ থেকে আমরা প্রকৃতি পড়ুয়ারা, কখনও নিমন্ত্রণ পাই না এমন। তবুও ওদের কাছে যেতে হয়। মাটির বুকে যে অর্কিড জন্ম নেয় তাদের না হয় কাছাকাছি যাওয়া সহজ। কিন্তু উঁচু গাছের ডালে, কিংবা পাহাড়ের সাংঘাতিক খাদের ধারে ফুটে থাকে অর্কিড-ফুল তাকে দূর থেকে দেখে খুশি হতে হয়। কিন্তু আমাদের ঘরের কাছে আম গাছের ডালে এক জাতের অর্কিড দেখেছি, 'রাস্না' বলে সবাই তাকে চেনে। তার কাছে গিয়ে কখনও দেখিনি। ফুলও ফুটতে দেখিনি। তবে পাহাড়ের ঢালে রাস্নার মরা পাতাওলা অর্কিড গাছে ফুল দেখেছি অনেকবার। তাই দেখে আমার ধারণা হয়েছে শুধু গাছের ডালে নয়, মাটিতেও অর্কিড ফুলের শোভা নিয়ে বসতে পারে। রহস্যটা এইখানে— অর্কিডের বীজ ঠিক জায়গায় পড়লে সেখানে গাছ হবে

ঠিকই। খুলে বলছি রহস্যটা কোন্ খানে। সবরকম আবহাওয়া পরিবেশে নয়, যে কোনো অর্কিড জন্মাতে পারে। গাছের ডালে যেমন দেখেছি, পাহাড়ের ঢালেও তেমন দেখেছি। (মজার কথা, হুগলি জেলার চন্দননগরের কাছে এক গ্রামে প্রকৃতি-পড়ুয়ারা ক'জন একবার 'গ্রামের পথে হাঁটতে' হাঁটতে হাঁটতে এক ধরনের অর্কিডের দেখা পেয়েছিল— 'ভুঁই অর্কিড'— তার নাম দিতে পারা যায়)। আসল কথা হল, অর্কিডের বীজ হয় লাখো লাখো। এত হালকা তারা, যে হাওয়ায় এক ফুঁয়ে অনেক দূর উড়ে যেতে পারে বীজগুলো। তবে গাছ হবার মতো ঠিক ঠিক জায়গায় বীজটি পড়তে হবে— এই "ঠিক অবস্থা" গাছ বোধহয় নিজেই বুঝতে পারে, আমাদের কাছে তা অজানা। যদি সব ঠিক মিলে যায়, জমি-জল-আলো-হাওয়া অনুকূল হয় তবে বীজ থেকে শেকড় বেরোবে মাটি আঁকড়ে ধরতে, পাতার-মুকুল বেরোবে সূর্যের আলোকে কাজে লাগিয়ে খাবার বানাতে। তাহলে, আমরা যে বলি অর্কিড পরগাছা সেই কথাটা খাটে না—

অর্কিড নিজের পুষ্টির উপায় নিজেই করে।

অর্কিড পরগাছা কী পরগাছা নয়— এইকথা নিয়ে তর্ক জমতে পারে। আমার যুক্তি অর্কিড শুধু গাছে নয়, মাটিতেও জন্মায়। গাছের রাজ্যে অর্কিড পরিবার 'বিশাল জমি' দখল করে আছে। প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে মানুষের সঙ্গে তাদের ভালোবাসা, চেনাজানা তিরিশ হাজার নমুনা মানুষ খুঁজে দেখে আপন করেছে।

খোঁজ-খবর চলছেই— চেনা নমুনার তালিকা বড়ো হচ্ছে। কিন্তু যে গাছ নিজের খাবার নিজেই বানিয়ে নিতে পারে, গাছের ডালে বসে বসেও— তাকে পরগাছা কোন নিয়মে বলব? তর্ক চলুক।

এই সুযোগে আমি একটি খবর দিয়ে রাখতে চাই— মানুষের হাতে অনেক নতুন নতুন অর্কিড রূপ পাচ্ছে। অর্থাৎ অর্কিডের সংকরায়ণ হচ্ছে। ভয় হয়, এই সংকরায়ণ এত বেশি বেশি হচ্ছে, যে কারণে আমরা আসল অর্কিডকে ভুলে যেতে পারি!

অর্কিড ফুলের রং রূপের জন্য যেমন, তার গন্ধের জন্যেও এত চাহিদা হয়েছে বিশ্বজুড়ে। বন-পাহাড় তোলপাড় করে খুঁজলেও অত নমুনা মিলবে না। তাই সংকরায়ণ ছাড়া উপায় কী। আমরা কিন্তু আসল অর্কিড দেখার চেষ্টা করব, চিনতে চেষ্টা করব আগে। অর্কিডের বই আর ছবি তো আছেই, যাঁরা শখের অর্কিডের 'বাগান-কোঠা' তৈরি করেন প্রাথমিক জ্ঞান সেখান থেকে নেব। ফুল দেখার যত নিয়ম আছে সব মেনে, আরও দেখব কোন ফুলে কেমন ধরনের মাছির আনাগোনা। একই রকমের মাছি কী ভিন্ন ভিন্ন রকমের অর্কিড ফুলে বসে, না বিশেষ ফুলের জন্যে বিশেষ মাছিই প্রকৃতির নিয়মে ঠিক করা। চলো তবে পশ্চিম-উপকূলের বন থেকে শুরু করি। তারপর হিমালয়ের পশ্চিম থেকে পূবে, সেখানে পারি সেখানেই, অর্কিডের খোঁজে সময় বুঝে হাজির হই।

প্রত্যেক মাসের প্রথম রবিবার বিকেলে বসে প্রকৃতি পড়ুয়ার পাঠশালা। কার্যালয়ে যোগাযোগ কর।

পূর্ব প্রকাশিতর পর

জয় বাবা ফেলুনাথ

চিত্রনাট্য প্রথম খসড়া

শিল্পনির্দেশনা অশোক বোস

সহকারী
ভোলা পালিত
শতদল মিত্র

ভাস্কর পাত্র
অমলকুমার বসু
সমীরণ রায়
পান্নালাল যাদব
এবং
শ্রীমান জিৎ বোস

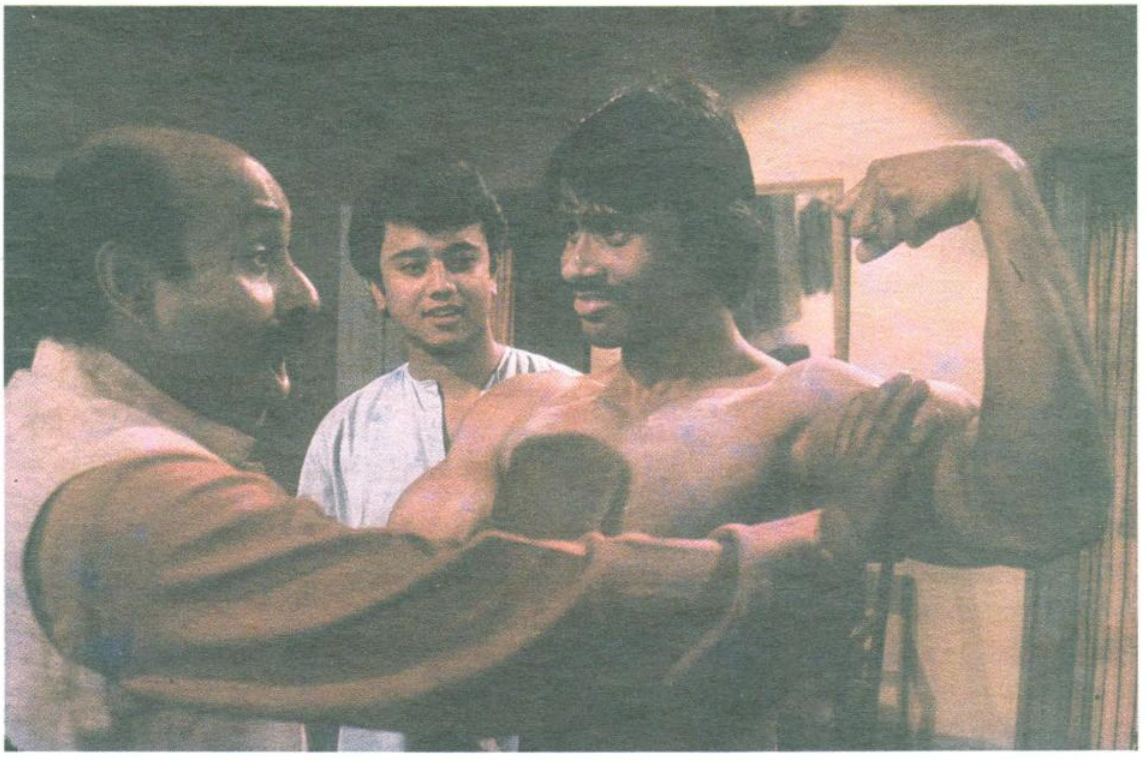

ROOM NO 3 / CALCUTTA LODGE / EVENING

বিশ্বশ্রী গুণময় বাগচী সবেমাত্র স্নান করে এসেছেন, তিনি এখন গামছা দিয়ে মাথা মুছছেন, ফলে তার শরীরে সর্বত্র মাংসপেশী সঞ্চালিত হচ্ছে।
লালমোহন, ফেলু ও তোপ্‌সে ঘরে ঢোকে। যে যার খাটে গিয়ে বসে, কারুর মুখে কোন কথা নেই, তোপ্‌সে-লালমোহন আড়চোখে বিশ্বশ্রীকে এবং পরস্পরের দিকে দেখে। ফেলু একটা সিগারেট ধরায়।
বিশ্বশ্রী মাথা মুছতে মাত্রাতিরিক্ত সময় নেয়। শেষটায় ফেলু আর যেন সহ্য করতে না পেরেই মুখ খোলে।

ফেলু আপনার নাম শুনেছি, চাক্ষুষ দেখা হয়নি।

লাল আমরা এসেই শুনেছি আপনি আমাদের ঘরে রয়েছেন। আমাদের খুবই সৌভাগ্য।

গুণ বেঙ্গলি ক্লাবে একটা শো আছে— পারলে আসবেন। সপ্তমীর দিন।

বিশ্বশ্রী এবার শুকনো গায়ের উপরেই গামছা চালায়।

লাল আপনার হাতের গুলি কি সত্যিই ষোল ইঞ্চি?

গুণ সাড়ে ষোল। Sixteen half—

গুণময় বাইসেপ ফুলিয়ে লালমোহনের দিকে এগিয়ে যায়—

গুণ Feel করুন—

লালমোহন হাত দিয়ে টিপে দেখে—

লাল বাপ্‌রে বাপ্— মানুষের গায়ে হাত দিচ্ছি বলে মনেই হয়না— সেই লৌহ ভীমের কথা পড়িচি মহাভারতে—

গুণময় demonstration চালিয়ে যায়—

গুণ Triceps-feel করুন।

লাল (Feel করে) আচ্ছা! এটা হলে Triceps–আর ওটা বাইসেপ। Tri-এর উপরেও কিছু আছে নাকি?

গুণময় আরেকটা muscle ফোলায়।

গুণ Quadriceps (demonstrates)

লাল এতো muscles-এর ভীড়ে তিল ধরার জায়গা নেই মশাই। যাকে বলে head to toe।

গুণ 400 muscles on each side of the body। এই যে ভুরু নাচাচ্ছি-এও muscles। হাঁ করছি-muscle, ভাত খাচ্ছি, muscle। শরীরের প্রত্যেকটি movement এর পিছনেই একটা করে muscles।

লাল সবগুলিরই একটা করে নাম আছে?

গুণ Each and every।

ফেলু লিখে নিন— আপনার গপ্পে কাজে লাগবে।

বাগচী এখন প্রসাধন শুরু করেছে।

লাল সত্যি, আমরা কত কম জানি। এ জিনিস না দেখলে বিশ্বাস করতুম না। কী সাধনা— অ্যাঁ, ফেলুবাবু?

গুণ And discipline। (তোপ্‌সের দিকে দেখিয়ে) ওকে ছেড়ে দিন না আমার হাতে— ছ'মাসে ভোল পালটে দেব।

ফেলু কিরে, পালটাবি? ভোল?

তোপ্‌সে মৃদুহাস্য করে।

লাল তা আপনি কি লোহাটোহাও ব্যাঁকান নাকি?

গুণ হ্যাঁ— rod twisting। বেঙ্গলী ক্লাবে দেখাব।

লাল আর weight lifting?

গুণ ওটা আমরা করি না— তবে কাকে তুলতে হবে? আপনাকে?

লাল না, মানে—

গুণ আসুন না—

বাগচী এক ঝটকায় লালমোহনকে মাথার উপর তুলে নেয়।

লাল আরে আরে! সর্বনাশ! উঃ—

গুণময় আবার তাকে মাটিতে নামায়—

লাল উঃ— বাপ্‌রে বাপ্! এ এক অভিজ্ঞতা হল মশাই।

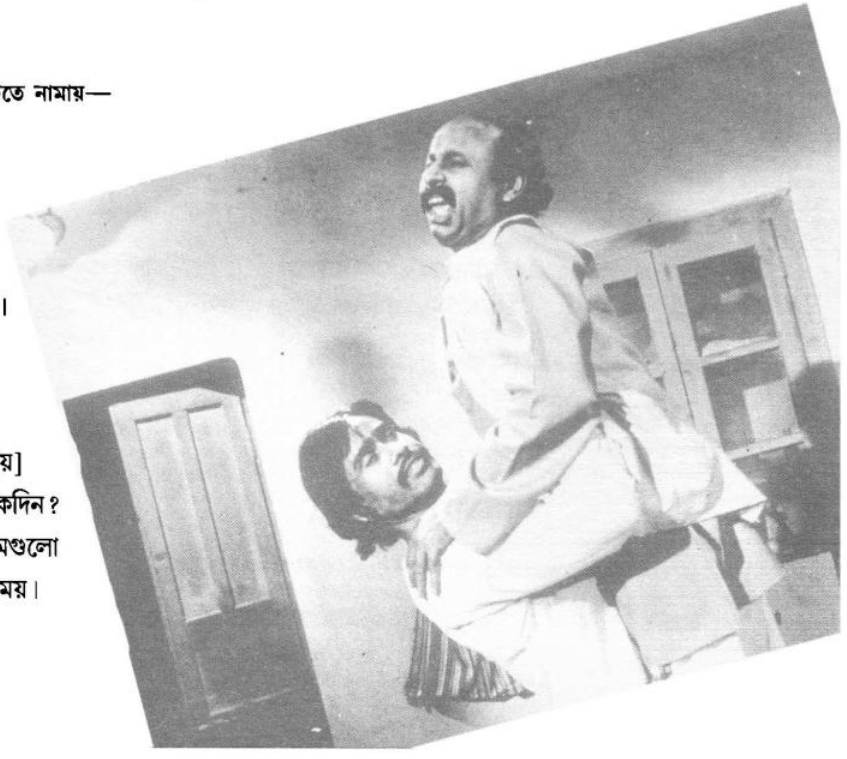

গৌর চাকর ঘরে ঢোকে।

গৌর (ফেলুকে) আপনার টেলিফোন।

ফেলু একটু অবাক হয়ে উঠে পড়ে।

ফেলু এরই মধ্যে! [ফেলু বেরিয়ে যায়]

লাল (বাগচীকে) আপনি আছেন ত কদিন? মানে, main muscles-এর নামগুলো একটু নোট করে নেব একটা সময়।

MANAGER'S ROOM

ফেলু টেলিফোন তোলে।

ফেলু হ্যালো—

উমা (OS) মিস্টার মিত্তির?

ফেলু হ্যাঁ, বলুন—

উমা (OS) বাবার সঙ্গে কথা বলেছি— উনি মোটামুটি রাজি—

ফেলু ও—

উমা (OS) অপনি কাল নটা নাগাৎ একবারটি চলে আসুন। আমাদের বাড়িটা মিঃ চক্রবর্ত্তী বুঝিয়ে দেবেন— আপনার খুঁজে পেতে কোনো অসুবিধা হবে না।

দৃশ্য ৪

GHOSHALS' RESIDENCE / EXT / MORNING

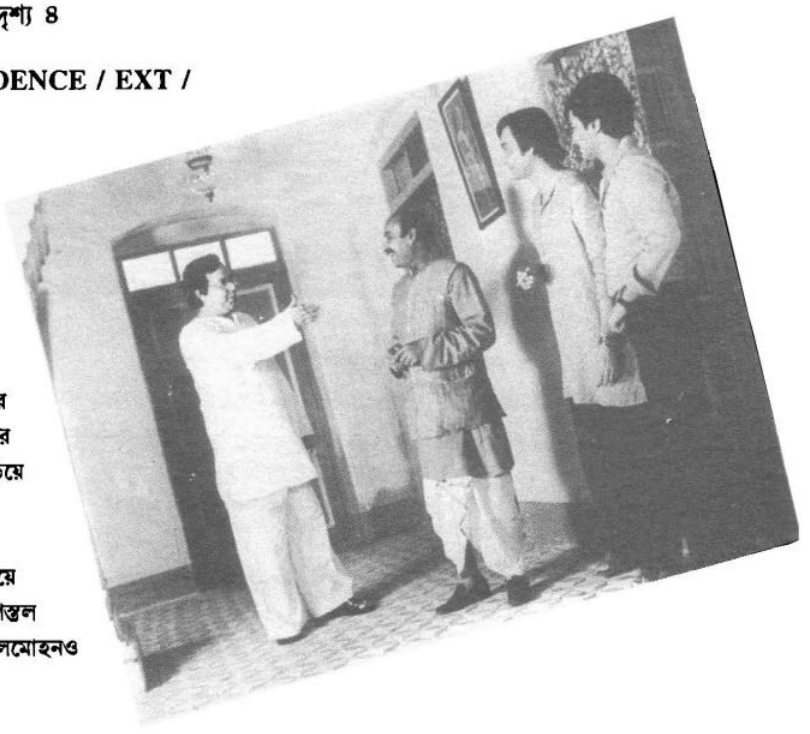

ফেলু, লালমোহন, তোপ্‌সে ফটক দিয়ে ঢুকে বাড়ির দিকে এগোয়। গাছপালায় ঘেরা বিশাল জমির উপরে প্রকাণ্ড বাড়ি। বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে হঠাৎ একটা Cap pistol এর শব্দ শুনে ফেলুর দৃষ্টি উপরের দিকে যেতেই সে থমকে দাড়িয়ে যায়। একটি বছর সাতেকের ছেলে ছাতের পাঁচিলের উপর দাঁড়িয়ে আছে নির্ভয়ে হাতে একটি পিস্তল নিয়ে। তোপ্‌সে আর লালমোহনও উপরের দিকে দেখে থ।

ফেলু দেখেছেন কাণ্ড!

লাল এ জিনিস দেখলেই পেটের ভেতরটা কেমন জানি করে মশাই। আপনি একটা কিছু করুন।

ফেলু ও ছেলে আমাদের কথা শুনবে না— চলুন ভেতরে—

এগিয়ে যেতেই গাড়ি বারান্দার নিচে একটি বছর সাতাশের যুবককে দেখা যায়। ইনি বিকাশ সিংহ। ফেলুদের দিকে এগিয়ে আসেন।

ফেলু আমার নাম প্রদোষ মিত্র।

বিকাশ আসুন—

চারজনে বাড়ির ভিতরে ঢোকে।

DRAWING ROOM

ফেলু, লালমোহন, তোপ্‌সে, বিকাশ আসে।

বিকাশ আপনারা বসুন। আমি মিস্টার ঘোষালকে খবর দিচ্ছি।

বিকাশ বেরিয়ে যায়।

লাল অট্টালিকা। বাড়ি বললে ভুল হবে।

ঘরের দক্ষিণের দরজা দিয়ে বাইরের উঠোনটা দেখা যায়। তোপ্‌সে সেই দিকে এগিয়ে গেছে।

তোপ্‌সে ঠাকুর তৈরি হচ্ছে ফেলুদা—

ফেলু আর লালমোহনও এগিয়ে যায়। শশীবাবুকে দেখা যায় রঙ করতে।

লাল এতো দেখছি কলকাতার মতোই ঠাকুর— মশাই।

ফেলু কাশী হল বাঙালিদের second home, লালমোহন বাবু। দেড় লাখ বাঙালি আছে কাশীতে।

উমানাথ ঘোষাল আসেন।

উমা Good morning! বাবা হচ্ছেন গোয়েন্দা কাহিনীর ভীষণ ভক্ত। এখন ত কাজ নেই, রাতদিন ওই পড়েন। বসুন—

লাল বাঙলা না ইংরিজি?

উমা কোনোটাই বাদ নেই। (ফেলুকে) তাই আপনার নাম শুনতেই রাজি হয়ে গেলেন।

ফেলু একটা কথা আগে বলে নিই— আপনার বাড়ির ছাতে যে ছেলেটিকে দেখলাম সে কি আপনারই?

উমা রুকু? এ বাড়িতে ছেলে বলতে ত ওই একটিই।

ফেলু ও কিন্তু অত্যন্ত বিপজ্জনক ভাবে ছাতের পাঁচিলের উপর দাঁড়িয়ে ছিল, তাই ভাবলাম...

উমা উফ্‌ফ্! (calling) বিকাশ!— ও ওইরকমই। অষ্টপ্রহর কী যে ঘুরছে ওর মাথায়!

বিকাশ আসে।

উমা রুকুকে ডাকত। ছাতে আছে। বল বাবা এক্ষুনি ডাকছেন।

বিকাশ চলে যায়। উমানাথ ফেলুর দিকে দৃষ্টি দেয়।

উমা আপনাকে মোটামুটি ব্যাপারটা বলি। চুরি যেটা গেছে সেটা হল একটা গণেশের মূর্তি। এই এতখানি লম্বা— সোনার তৈরি, তার উপর পাথর-টাথর বসানো। দাম হবে ধরুন আজকের দিনে প্রায় ষাট সত্তর হাজার টাকা। নেপালের জিনিস, নেপাল থেকেই আনা। ওই যে ছবি দেখছেন— উনি হচ্ছেন আমার ঠাকুরদাদা ডাক্তার রাধানাথ ঘোষাল। উনি এককালে নেপালের এক রাণার family physician ছিলেন। একবার এক কঠিন ব্যারাম থেকে রাণাকে বাঁচান—

ফেলু রাণা খুশি হয়ে গণেশটা দেয়—

উমা হ্যাঁ। আর এই গণেশটা পাবার পর থেকে অনেকগুলো ছোটবড় ঘটনা থেকে একটা বিশ্বাস জন্মায় যে ওটা খুব lucky।

ফেলু সে সব ঘটনা কি নেপালে—?

উমা না— আমার ঠাকুরদা গণেশটা পাবার কিছু পরেই বেনারস চলে আসেন। এখানে প্র্যাকটিস করেন, খুব নাম হয়, পসার হয়, এই বাড়িটা তাঁরই তৈরি। তারপর আমার বাবার ওকালতিতে success, আমার তিনটি বোন, তাঁদের সকলেরই খুব ভাল বিয়ে হয়েছে— ইত্যাদি ইত্যাদি। মোটকথা ঘোষাল বাড়ির এই গণেশের, বলা যেতে পারে, একটা খ্যাতি আছে। এখন, তিন দিন আগে, গত শনিবার একটি ভদ্রলোক এসে গণেশটি আমার কাছে কিনতে চান! বিশ থেকে চড়ে ত্রিশ হাজার পর্যন্ত offer করেন।

ফেলু ভদ্রলোকটি কে?

উমা এঁর নাম হচ্ছে মগনলাল মেঘরাজ।

ফেলু ও— যাকে কাল দেখলাম মছলিবাবার ওখানে?

উমা Exactly । ইনি আবার ছিলেন আমার কলেজের সহপাঠী। অমি স্বভাবতই গণেশটা বিক্রী করতে রাজি হইনি। এমনিতেও সেটার প্রশ্ন ওঠেনা— কারণ জিনিসটা ত আর ঠিক আমার নয়! ওটা এনেছেন ঠাকুরদা, থাকে বাবার ঘরের সিন্দুকে, আমি থাকি কলকাতায়, কাজেই—

ফেলু মগনলালের প্রতিক্রিয়া কী হয়?

উমা ও চলে যায়। তবে খুব খুশি মনে যায়নি সেটা বলাই বাহুল্য।

ফেলু চুরিটা হয় কবে?

উমা তার পরদিন রাত্রে। বাবা সকালে উঠে দেখেন সিন্দুক থেকে চাবি ঝুলছে, খুলে দেখেন গণেশ নেই।

ফেলু I see...

উমা রহস্যটা হচ্ছে— আমাদের বাড়িতে চাকর বাকর যা আছে তা সবই পুরোনো এবং বিশ্বস্ত। তাছাড়া

লোক বলতে বাবা, আমি, আমার স্ত্রী। বিকাশ, আমার ঠাকুরদা।

ফেলু উনি এখনো—

উমা জীবিত। 85 । অবিশ্যি প্রায় অথর্ব। আর আমার ঠাকুমাও আছেন। তিনি এখনো বেশ শক্ত।

ফেলু আর আপনার পুত্র—?

কথাটা বলার কারণ রুকু পিস্তল হাতে এই মাত্র বিকাশের সঙ্গে এসে ঘরে ঢুকেছে। রুকু বেশি কাছে আসেনা; একটা সোফার পিঠে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বাপের দিকে চেয়ে থাকে। উমানাথ বেশ রুক্ষস্বরে কথা বলে।

উমা তুমি ছাতের পাঁচিলে উঠেছিলে?

রুকু মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলে।

উমা কেন? যদি নিচে পড়ে যেতে? তুমি জান না এরকম করতে হয় না?

রুকু ক্যাপ্টেন স্পার্ক ত ছাতের পাঁচিলে ওঠে।

লাল (স্বগত) সেরেছে!

উমা কে?

রুকু ক্যাপ্টেন স্পার্ক।

লাল (explaining) রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজের একটি daredevil চরিত্র।

রুকু পঁচাশি তলা বাড়ির ছাতে ওঠে।

লাল কার্নিশ দিয়ে হাতে হেঁটে যায়— মাথা নিচু, পা উচু।

উমা এসব বই কে এনে দিচ্ছে ওকে? (বিকাশকে) তুমি?

বিকাশ আজকাল ত সব ছেলেই—

উমা আর দেবে না! যত সব উদ্ভট, গাঁজাখুরি গল্প পড়বে আর dangerous সব শখ মাথায় চাপবে। (রুকুকে) ফের যদি শুনি তুমি ওরকম দুষ্টুমি করেছ তাহলে ঘরে তালাচাবি বন্ধ করে রেখে দেব। যাও—

রুকু-বিকাশ বেরিয়ে যায়।

ফেলু বিকাশ বাবুর পরিচয়টা কী?

উমা বিকাশ আমাদের বাড়ীতেই মানুষ। বাবারই এক কর্মচারীর ছেলে— অল্পবয়সে বাপমাকে হারায়— তারপর বাবাই ওকে বাড়ীতে রেখে মানুষ করেন।

ফেলু কী করেন ভদ্রলোক?

উমা বাড়ীর কাজকর্ম কিছু কিছু করে। আর একটা হিন্দি পত্রিকার আপিসে চাকরি করে।

ফেলু উঠে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে অন্যরাও।

ফেলু আপনার বাবার সঙ্গে কি একবার— ?

উমা নিশ্চয়ই। উনি ত wait করছেন আপনার জন্য। তবে আপনাকে জানিয়ে রাখা ভালো— বাবা কিন্তু একটু খামখেয়ালি মানুষ। আর মগনলালের সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল সেটা কিন্তু বাবা জানে না—

STAIRCASE

চারজনে উঠে আসে। কোত্থেকে যেন একটা পুরোন গান শোনা যাচ্ছে।

ফেলু রেকর্ড বাজছে মনে হচ্ছে?

উমা আমার ঠাকুরদা। খুব গানের শখ ছিল। এখন একটি চাকরের কাজই হল গ্রামোফোনে চাবি দেওয়া আর রেকর্ড চাপানো। *(চলবে)*

ফোটো : সন্দীপ রায়

কুইজ

আঁকাজোকায় উঁকিঝুঁকি

১। কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'ভবম্‌হাজাম্‌' গল্পের প্রথম ছবি আঁকেন— পরবর্তীকালে অবনীন্দ্রনাথের 'খাজাঞ্চির খাতা' চিত্রিত করেন তিনিই— কে তিনি?

২। নন্দলাল বসুর আঁকা ছবিতে সাজানো 'সহজপাঠ'— কিন্তু একটি ছবিতে ছিল সামান্য ত্রুটি— কি সেই ত্রুটি?

৩। রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের লেখা চিত্রিত করতেন এবং পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের বইয়ের চরিত্র হয়ে ওঠেন— কে তিনি এবং কোন্‌ বইয়ের কথা বলা হয়েছে?

৪। দক্ষিণারঞ্জন, সুনির্মল বসু, লীলা মজুমদার ও শিবানী রায়চৌধুরী— এঁদের মধ্যে একটি বিশেষ মিল আছে। সেটি কি?

৫। বিমল দাসের আবির্ভাব ঘটেছিল একটি পত্রিকার মাধ্যমে— সেই পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক ছিলেন পরবর্তী কালের এক বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক— পত্রিকাটি কি এবং কে ছিলেন সেই সম্পাদক?

৬। খালেদ চৌধুরী চিত্রিত প্রথম ছোটদের বই কোনটি?

৭। সন্দেশ পুনঃপ্রকাশের বেশ কিছু আগে সত্যজিৎ একটি পত্রিকায় ছবি আঁকেন, বিভিন্ন লেখার নামাঙ্কন করেন এবং বিশেষ দু'টি সংখ্যার প্রচ্ছদ এঁকে দেন— কোন পত্রিকা এবং কোন বিশেষ দুটি সংখ্যা?

৮। অবনীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত কবিতার ভাবরূপ অবলম্বনে একটি রঙিন ছবি এঁকে দিয়েছিলেন— কোন কবিতা, এবং কোন পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়েছিল?

৯। আমি রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী ও জীবনস্মৃতি চিত্রিত করি— 'বিরূপবজ্র' ও 'নবহুল্লোড়' আমার দুটি কার্টুনের বই। নাতিদের অনুরোধ না ঠেলতে পেরে তাদের হাতে লেখা পত্রিকায় একটি বড় লেখা দিই— নাম 'দাদামশায়ের দেয়ালা'— সেটি অন্য নামে বিখ্যাত। —আমি কে?

১০। সত্যজিৎ যখন সৃজনশীলতার শীর্ষে তখন আমি তাঁর 'সেপ্টোপাসের খিদে' গল্পটিতে ছবি আঁকি। জন্তু-জানোয়ারের ছবি আঁকাতে বাংলাদেশে আমার জুড়ি নেই, অন্য নামে আমি একজন রীতিমত দক্ষ কমিক্‌স্‌ স্রষ্টা ও লেখক— কোন নামে আমি ছবি আঁকতাম?

১১। শিশুসাথী পত্রিকাটির মাধ্যমে আমরা পেয়েছিলাম শিশুগ্রন্থ— চিত্রণে দু'জন বিশিষ্ট শিল্পীকে— তাঁরা কারা?

১২। আমি 'পদিপসির বর্মীবাক্স' বইটি চিত্রিত করি, 'রূপদর্শীর নক্সা'র সঙ্গে কার্টুন এঁকে অনেকের চিত্ত জয় করি— পরবর্তীকালে শিল্পকলা নিয়ে লেখালিখি করতাম— আমার চিত্রিত আরেকটি ছোটদের বই অন্নদাশংকরের 'হৈ রে বাবুই হৈ'— আমি কে?

সুগত রায় ও বিনীতা ঘোষ

উত্তর

১। সুকুমার রায়। ২। 'তিনটি শালিখ ঝগড়া করে রান্নাঘরের চালে'— ওই ছবিতে দুটি শালিখ। ৩। হ. চ. হ. বা হরিশচন্দ্র হালদার, গল্পসল্প। ৪। এঁদের প্রত্যেকেই তাঁদের প্রথম বইয়ের ভেতরের ছবি নিজেরাই চিত্রিত করেছেন— যেমন দক্ষিণারঞ্জন ঠাকুমার ঝুলি, সুনির্মল বসু পাতার ভেঁপু, লীলা মজুমদার বদ্যিনাথের বড়ি, শিবানী রায়চৌধুরী ইস্তাবিলের পুঁথি। ৫। রবিবার, শৈলেন ঘোষ। ৬। পিলেপটকার বিয়ে। ৭। রংমশাল, সুকুমার ও গান্ধী সংখ্যা। ৮। 'জগৎপারাবারের তীরে শিশুরা করে খেলা', মৌচাক। ৯। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১০। প্রসাদ রায় (ময়ূখ চৌধুরী, এটিও ছদ্মনাম। আসল নাম শক্তিপ্রসাদ রায়চৌধুরী)। ১১। ফণী গুপ্ত ও পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী। ১২। অহিভূষণ মালিক।

জটা পাগলার সমস্যা

গঙ্গারাম এসেছিল। ওর পিলের জ্বর আর পাণ্ডুরোগ আদৌ সারবে কিনা, সেটা জানতে। ওর এই সমস্যার সমাধান তো করেই দিয়েছি, তার ওপরে এমন দাওয়াই বাতলে দিয়েছি যে, ও উনিশবারের দুঃখ ভুলে আগামী বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসবে বলেছে। গঙ্গারামকে বিদায় করে সবে গাছতলায় চোখ বুজে একটু লম্বা হয়েছি, এমন সময় কানের পাশে কান্না-ভেজা গলায় ডাক, 'জটুদা'। চোখ খুলে দেখি হাতে একটা কাগজ নিয়ে আমার এক খুদে বন্ধু পটকা দাঁড়িয়ে আছে। কোনো কথা না বলে ও হাতের কাগজটা বাড়িয়ে দিল। দেখি ওতে আঁকা আছে ঠিক এরকম :

o o o
o o o
o o o

পটকা বলল, 'চারটে সরল রেখা এমনভাবে টানতে হবে যাতে এই ন'টা বলকে ছুঁয়ে থাকে।' আমি বললাম, 'ধ্যাত, এটা একটা সমস্যা হল!' পটকা বলল, 'কাগজ থেকে একবারও কলম না উঠিয়ে সরলরেখাগুলি আঁকতে হবে যে!' আমি হেসে বললাম, 'তাহলেও কোনো সমস্যা নেই।' তোমরাও চেষ্টা করে দেখ না।

শব্দ নিয়ে খেলা

এই খেলায় একটা শব্দকে বদলে দিতে হবে অন্য একটা শব্দে। শব্দ বদলের নিয়মটা হল, প্রত্যেক পরিবর্তনে তুমি হয় একটা বর্ণ বা বর্ণের সঙ্গে যুক্ত আ-কার, ই-কার, উ-কার ইত্যাদি মাত্রাগুলি বদলাতে পারবে। মনে রেখো, প্রতিটি পরিবর্তিত শব্দের কিন্তু নিজস্ব একটা অর্থ থাকতে হবে। যেমন ধরো, যদি বলা হয় 'তাল'কে 'সুর' করো, তাহলে এরকম করতে পারো : তাল > তার > পার > পুর > সুর। কেমন, পরিষ্কার? এইভাবে **'টাকা'**কে **'মাটি'** আর **'স্কুল'**কে **'মাঠ'** বানাও।

নভেম্বর সংখ্যার ধাঁধার উত্তর

জটা পাগলার সমস্যা

সমস্যা : ১-এর সমাধান

যে-কৌটোতে 'রসগোল্লা-পান্তুয়া' লেবেল লাগানো, শুধু সেই কৌটো থেকে একটা মিষ্টি তুলতে হবে। সেটা যদি রসগোল্লা হয় তবে রসগোল্লা লেবেলটা এই কৌটোয় লাগাতে হবে (হাতে পান্তুয়া উঠলে পান্তুয়া লেবেলটা এতে লাগবে)। এবার যে-কৌটোর লেবেল খোলা হয়নি, সেটা খুলে ওখানে 'রসগোল্লা-পান্তুয়া' লেবেলটা লাগাতে হবে। দুটো হল, তৃতীয়টা কি আর বলে দিতে হবে?

সমস্যা : ২-এর সমাধান

২৬টা মুরগি, ১৪টা গোরু।

সমস্যা : ৩-এর সমাধান

খোল-এর মালিক পোনা, ঢোল-এর মালিক ধনা, বাঁশির মালিক গজা আর ভজা, সানাই-এর মালিক পচা।

শব্দ নিয়ে খেলা

তামা → বামা → বোমা → বোনা → সোনা

পালক → পলক → অলক → অলস → কলস → কলম

শব্দ-জব্দ

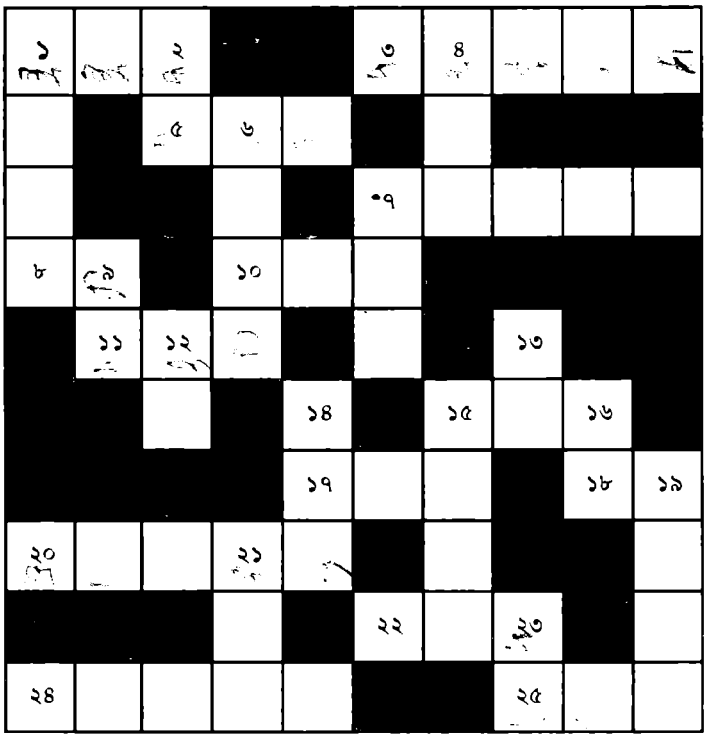

পাশাপাশি

(১) আমার সারা গায়ে কাঁটা
(৩) চড়ুইভাতি (৫) আমার বাস সমুদ্রে, কিন্তু ডিম পাড়তে আসি নদীতে (৭) শিব
(৮) প্রচারিত হওয়া (১০) ছোট জলাশয়
(১১) দরজার পাল্লা (১৫) ললাট
(১৭) চায়ের — (১৮) ছোটো মোটা কাপড় (২০) ভাইফোঁটা উৎসব
(২২) পুস্তক (২৪) বরখাস্ত
(২৫) উচ্চশিক্ষালয়।

উপর-নীচ

(১) খরগোশ (২) বড় মাছ
(৪) তত্ত্বাবধান (৬) ক্ষুদ্র মানব (৭) যাচাই
(৯) ইন্দ্রলুপ্ত (১২) জমি ভোগ করবার অধিকারপত্র (১৪) অবশিষ্ট (১৫) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী
(১৬) লক্ষ্য করা (১৯) — পণ্ডিত
(২১) ব্যাধ শ্রেণীর একটি জাতি।
(২৩) ধার্মিক।

সুগত দাশগুপ্ত

শারদীয়া প্রতিযোগিতার ফলাফল

প্রোফেসর শঙ্কুর যে-সাক্ষাৎকার মদন নিয়েছে, তার প্রতিটি তথ্যই ভুল।
সঠিক উত্তরগুলি হল :

(১) প্রোফেসর শঙ্কুর পুরো নাম ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু (ডাকনাম তিলু)।
(২) প্রোফেসর শঙ্কুর জন্মদিন ১৬ জুন। একটি অসমাপ্ত ডায়েরিতে অবশ্য জন্মদিন বলা হয়েছে ১৬ অক্টোবর।
(৩) ওঁর বাবা ত্রিপুরেশ্বর শঙ্কু ছিলেন গিরিডির অপ্রতিদ্বন্দ্বী চিকিৎসক। শঙ্কুর ঠাকুরদা বটুকেশ্বর শঙ্কু (একটি ডায়েরিতে অবশ্য বটুকেশ্বরকে শঙ্কুর অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে) আদৌ ভুলো মনের মানুষ ছিলেন না। তিনি ছিলেন শ্রুতিধর।
(৪) শঙ্কুর একটি খুড়তুতো ভাই আছেন যিনি থাকেন বেরিলিতে।
(৫) শঙ্কুর খুড়তুতো ভাই লম্বায় ছ'ফিট দু'ইঞ্চি আর শঙ্কু এখন লম্বায় দু'ইঞ্চি বড় হয়ে গেছেন।
(৬) লিন্ডকুইস্ট-এর আবিষ্কৃত ওষুধ দিয়ে অ্যাকরয়েড শঙ্কুকে দু'ইঞ্চি লম্বা করে দিয়েছিলেন।
(৭) শঙ্কু উশ্রীর ধারে মাঝে মাঝে প্রাতঃভ্রমণে যান আর শুধু আশ্বিন-কার্তিক মাসে রাতে খাবার পর বাগানে আরামকেদারায় শুয়ে ঘণ্টা তিনেক উল্কাপাত দেখেন।
(৮) মিরাকিউরলের একটি উপাদান হল গলদা চিংড়ির গোঁফ।
(৯) জগন্নাথ থাকে উশ্রীর ওপারে ঝলসি গ্রামে।

প্রথম পুরস্কার : ৩৯৪০ সৌমিক সরকার, বয়স ১৪ বছর।

শুধুমাত্র প্রথম পুরস্কারই দেওয়া হল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কারের জন্য কাউকে নির্বাচিত করা গেল না। কেননা কারোরই উত্তর অর্ধেকের বেশি ঠিক হয়নি।

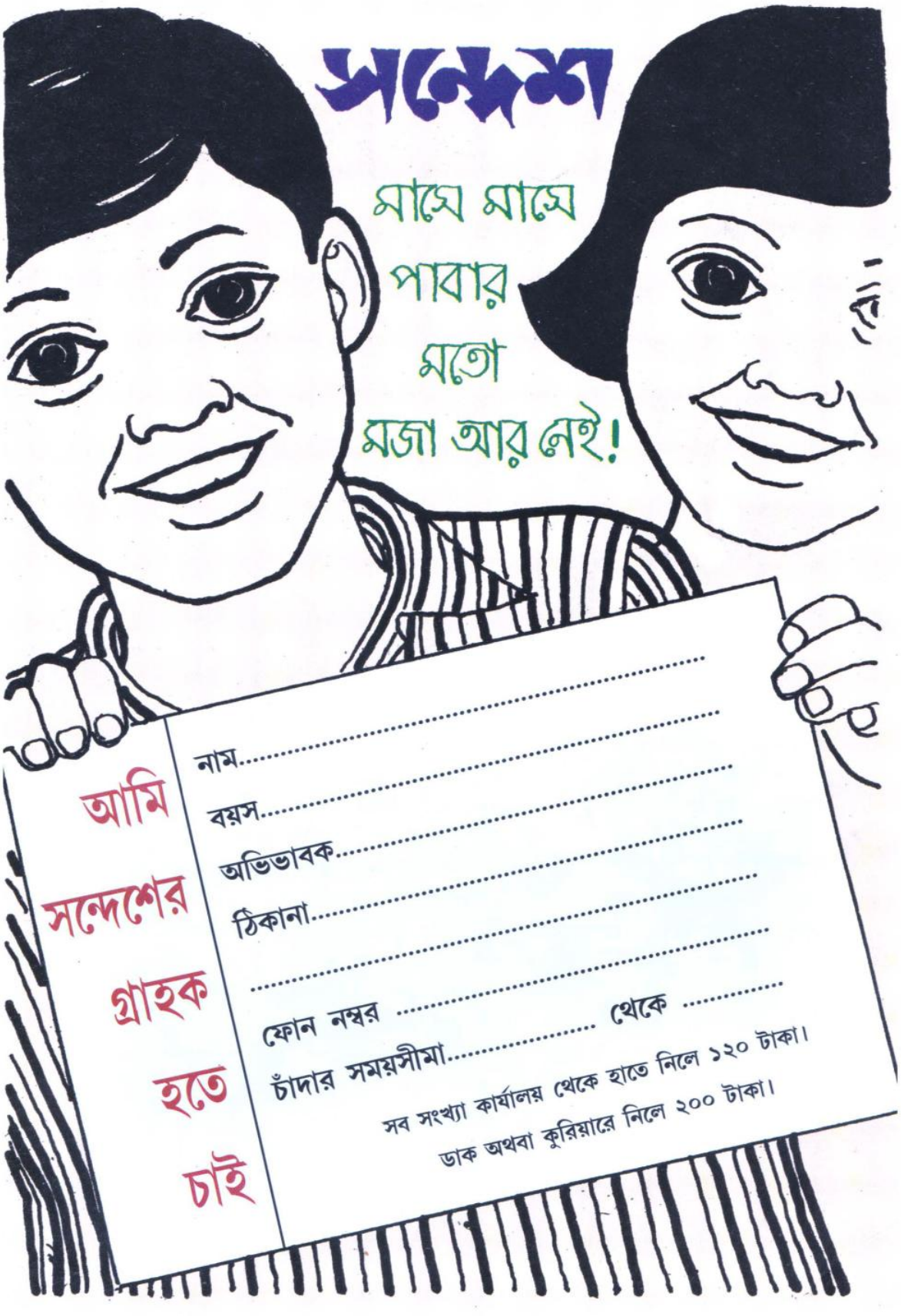

সন্দেশ কার্যালয় : ১৭২/৩ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ৭০০ ০২৯, ফোন : ২৪৬৬-৪৯১৯

Regd. NO. WB/SC–102 R.N.I. No. 12007/64
Sandesh January 2004 **Rs. 12**

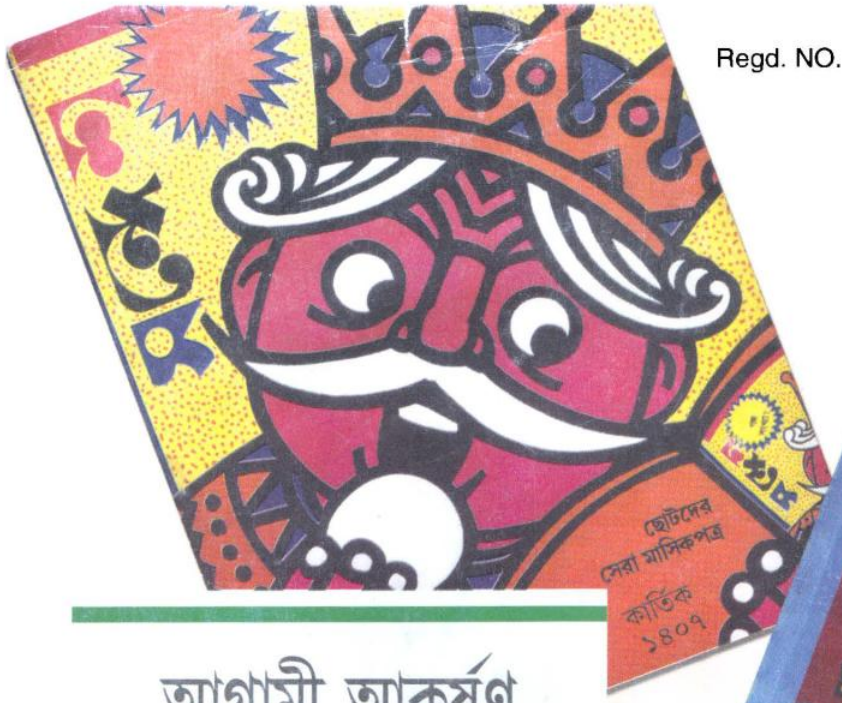

আগামী আকর্ষণ

বইমেলা

বিশেষ

গল্প-সংখ্যা